ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারী-মার্চ : ২০১৩

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা

শাহ্ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

সহকারী সম্পাদক

শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দিকা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সোলায়মান

প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৩

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : **জানুয়ারী-মার্চ** : ২০১৩

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

বিপণন বিভাগ : ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়..৫

আমদানি ও রপ্তানি কর্মে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জন : প্রেক্ষিত ইসলাম...৭
ড. মাহফুজুর রহমান

কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২৭
মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিধিবদ্ধ আইন ও ইসলামী বিধান : একটি পর্যালোচনা...৫৯
এহতেশামুল হক

বাংলাদেশে মাদক ও মাদকাসক্তির বিস্তার ও প্রভাব : উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি..৮৫
ড. মো: শামছুল আলম
সৈয়দ আমিনুল ইসলাম

ইসলামী বীমার শরঈ ভিত্তি ও বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায় ১১১
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

যৌতুক প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ১৩১
কামরুজ্জামান শামীম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

মানুষ সামাজিক জীব। অন্যের সাহায্য ছাড়া কোন মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণে সমাজে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। মূলত তারা একে অপরের সহায়ক। একজন আরেকজনকে বেঁচে থাকতে এবং সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করে। তেমনিভাবে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা সে দেশ যত উন্নত হোক না কেন। একটি দরিদ্র দেশে উৎপাদিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি উন্নত দেশেরও প্রয়োজন হয় অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করার। আধুনিক যুগে এ আমদানি ও রপ্তানি কাজে ইসলামী ব্যাংকগুলোও মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। সে ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কিভাবে তাদের সেবার বিনিময়ে হালাল ভাবে অর্থ উপার্জন এবং ব্যবসায়ীগণ কিভাবে সুদমুক্ত ভাবে আমদানি-রপ্তানি করতে পারেন তা তাদের জানা কর্তব্য।

আধুনিক যুগের আরেকটি জটিল বিষয় হলো "কৃত্রিম গর্ভধারণ এবং টেস্টটিউব বেবী"। এটি এখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সময় হয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সামনে তুলে ধরার।

এ যুগের আরেকটি সমস্যা পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়। এর জন্য যেমন বিভিন্ন দেশের সরকার দায়ী, তেমনি ভাবে জনসাধারণেরও দায়ভার কম নয়। বিষয়টি মানবজাতির অস্তি ত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অতি জরুরী।

www.pathagar.com

বাংলাদেশসহ গোটা পৃথিবীতে মাদক ও মাদকাসক্তির প্রভাব ও বিস্তার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বিষয়টি সুস্থ্য বুদ্ধির মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই এ থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলাম কী বিধান দিয়েছে এবং কোন পন্থা অবলম্বন করেছে তা আমাদের জানতে হবে।

অনুরূপ বীমা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে এর প্রসার ঘটছে। কিভাবে তা ইসলামীকরণ করতে হবে তাও একজন মুসলিমের জানা দরকার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিবাহ-শাদীতে যৌতুকের প্রচলন ও এর ভয়াবহ পরিণতি। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান জানা এবং সমাজে কিভাবে তা প্রয়োগ করে এর কুফল থেকে মানুষকে বাঁচানো যায় এ সম্পর্কে প্রত্যেকের সম্যক ধারণা লাভ করা সময়ের দাবী।

উপরোক্ত বিষয়গুলো 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। বিষয়গুলো যেমন অতিগুরুত্বপূর্ণ, তেমনি লেখকগণ বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের ইসলামী সমাধান উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধগুলো পাঠ করলে পাঠকগণ আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধানের প্রক্রিয়া জানতে পারবেন বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

-ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৩

আমদানি ও রপ্তানি কর্মে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জন : প্রেক্ষিত ইসলাম

ড. মাহফুজুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *মানুষ প্রকৃতি ও স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাই তার প্রয়োজন হয় অন্যের সাহায্য সহযোগিতার। মানুষ অন্যের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তেমনিভাবে পৃথিবীর কোন দেশই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন দেশই অন্য দেশ থেকে পণ্য না এনে নিজের উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করে চলতে পারে না। আবার নিজ দেশে উৎপাদিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে অর্থ আয়ের প্রয়োজনও হয় তার। এ কারণেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করে আসছে। এ ভাবেই মানব সভ্যতা গড়ে ওঠেছে, মানব সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং তার বিকাশ হয়েছে। আধুনিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্য ও পণ্য আমদানি-রপ্তানি পৃথিবীর সব দেশেই বেশ গুরুত্ব লাভ করে আসছে। কারণ বর্তমান যুগে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির প্রায় পুরোটাই নির্ভর করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। আর এই আমদানি-রপ্তানির কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে ব্যাংক। ব্যাংকিং সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান যুগে আমদানি-রপ্তানির কথা ভাবাই যায় না। বর্তমান যুগে মুসলমানরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে চ্যালেঞ্জ করে চলছে। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্বিক কার্যকারিতা প্রমাণ করে তা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে উত্তম, ইনসাফপূর্ণ, মানবিক এবং মানব-জাতির জন্য কল্যাণকর একটি অর্থ ব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার কার্যকারিতা ও মানবিকতা প্রমাণ করার দায়িত্ব মুসলমানদেরই। মুসলমানদেরকেই প্রমাণ করতে হবে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মানব-জাতির জন্য অন্যান্য যে কোন অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংক ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। এ প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকগুলো পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে কিভাবে ইসলামী শরীয়াহর বিধান বাস্তবায়ন করে সাহায্য সহযোগিতা করছে, আর কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে; সে সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।*]

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি

ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের আয়-রোজগার হয়। সন্দেহ নেই যে, এই আয়-রোজগার আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বার বার ব্যবসা বুঝাবার জন্য মহান আল্লাহ অনুগ্রহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন,
"হে ঈমানদারগণ যখন জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের (সালাতের) দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন কর। এটাই

* অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার"।[১]

মুফাস্‌সিরগণের মতে, আলোচ্য আয়াতে জুমু'আর দিন আযানের পর ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অতঃপর বলা হয়েছে, 'যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর'। এখানে 'আল্লাহর অনুগ্রহ' বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে। কারণ সালাতের আগে যে জিনিসটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সালাত শেষে তারই অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং সেই জিনিসটি হবে অবশ্যই ব্যবসা-বাণিজ্য। অতএব এ আয়াতে 'আল্লাহর অনুগ্রহ' ব্যবসা বাণিজ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেন, "তোমাদের জন্য (হজ্জের সময়) আল্লাহর অনুগ্রহ্ লাভ করাতে কোন ক্ষতি নেই"[২] প্রায় সকল মুফাস্‌সির ও ফকীহ্‌র মতে অত্র আয়াতে "ফাযলাম মির রাব্বিকুম" বা "তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ" বাক্য দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতে হজ্জের সময় হাজীদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৩]

প্রাচীনকালে পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ীদের দেশভ্রমণ করতে হত। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেশ ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে'।[৪]

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'এক দল ব্যবসার জন্য দেশভ্রমণ করবে অপর এক দল আল্লাহর পথে জিহাদ করবে'। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা জিহাদের আলোচনা ও

---

১. আল কুরআন, ৬২ : ৯-১০

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

২. আল কুরআন, ২ : ১৯৮ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

৩. মাজমুআতুন মিনাল মুয়াল্লিফীন, *ফিক্‌হুল মুআমালাত*, মাকতাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৩৭৯

৪. আল কুরআন, ৭৩ : ২০

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

www.pathagar.com

ব্যবসার আলোচনা পাশাপাশি করে উভয় কাজকে প্রায় সমান মর্যাদাবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন। অতএব আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা আর মানুষের জরুরী পণ্য সমস্যা সমাধানকল্পে পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য দেশ ভ্রমণ করা প্রায় সমান মর্যাদার কাজ।

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতে পণ্য আমদানি-রপ্তানির গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আমদানি-রপ্তানির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি নিজে আমদানি-রপ্তানির কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিশোর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার জন্য সিরিয়া গমন করেন। আবার নুবুওয়ত লাভের পূর্বে খাদীজা রা.-এর ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসেবে আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে সিরিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও মক্কা থেকে পণ্য আমদানি করতেন বলে জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন তার 'ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ' নামক গ্রন্থে 'আন্তর্জাতিক বাই সালাম' শিরোনামে লিখেন, ইসলাম বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষপাতী। 'মাবসূত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের এমনকি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পূর্বেও আবু সুফিয়ানকে মদীনার খেজুর দিয়ে তার বিনিময়ে মক্কা থেকে চামড়া আমদানি করতেন"।[৫]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর বিভিন্ন হাদীসে পণ্য আমদানি-রপ্তানির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এখানে এতদসংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো:

আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে আমদানিকারক এক দেশ হতে অন্য দেশে খাদ্যপণ্য আমদানি করে অতঃপর তা সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করে; অবশ্যই সে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে"।[৬]

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে আমদানিকারক বিদেশ হতে কোন মুসলিম দেশে খাদ্যপণ্য

---

[৫]. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *মাবসূত*, সারাখসী, খ. ১০, পৃ. ৯২; এবং *শারহুস সিয়ারিল কাবীর*, সারাখসী, খ. ১, পৃ. ৭০, দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩, খ. ২, পৃ. ৯৮

[৬]. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০২, খ. ১৯, পৃ. ৪৮

عن علقمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء"

www.pathagar.com

আমদানি করে, অতঃপর তা সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করে, অবশ্যই সে আল্লাহর নিকট শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আর একদল পৃথিবীতে বিচরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করে, আর একদল আল্লাহর পথে জিহাদ করে' আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[৭]

আল্লামা ইরাকী 'ইহইয়ায়ু উলূমুদ্দীন' এর তাখরীজের এক স্থানে হাদীসটি 'মুরসাল' হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন, আবার অন্য স্থানে হাদীসটি ইবন মারদাওয়াইহ তার তাফসীরে ইবন মাসউদ রা. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন।[৮] অতএব হাদীসটি দুর্বল।

পণ্য আমদানি করা; বিশেষত খাদ্যপণ্য আমদানি করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কারণ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য আমদানির ফলে যে দেশে যে পণ্যের অভাব হয় তা পূরণ হয়ে যায়। ফলে মানুষের পণ্যের অভাব দূর হয়; তাদের কষ্ট দূরীভূত হয় এবং সংকট নিরসন হয়।

এ হাদীসে খাদ্যপণ্য আমদানির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, খাদ্যপণ্য মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষ অন্য পণ্য ছাড়া কিছু দিন বাঁচতে পারলেও খাদ্যপণ্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। খাদ্যপণ্য আমদানির কারণে খাদ্য পণ্যের সরবরাহ বাড়ে, এবং মানুষের খাদ্যের অভাব দূরীভূত হয়। আর আমদানিকারকরা অধিক মুনাফা লাভের জন্য কোন কারসাজী না করে সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী যদি তা বিক্রি করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।

এ হাদীসের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আর একদল পৃথিবীতে বিচরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করে' আয়াতটি তিলাওয়াত করার কারণ হলো, এ আয়াত দ্বারা পণ্য আমদানি করার গুরুত্বের প্রমাণ পবিত্র কুরআন থেকে পেশ করা।

ইবন মাসউদ রা. থেকে অপর এক হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে লোক মুসলমানের কোন শহরে ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের আশায় কোন পণ্য আমদানি করে, অতঃপর তা সে দিনের বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করে, সে অবশ্যই আল্লাহর

---

৭. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছুর ফিত্ তাফসীরি বিল মাছুর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৩, খ. ৮, পৃ. ৩২৩

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما من جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلاد المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد " ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله

৮. মুহাম্মাদ আল গাযালী, *ইহইয়ায়ু উলূমিদ্দীন, ওয়া মা'হু তাখরীজুল হাফিয আল ইরাকী*, খ. ২, পৃ. ৩৭০; (মাকতাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)

www.pathagar.com

কাছে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. "আর এক দল আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ বিদেশ সফর করে" (অর্থাৎ আল্লাহর রিযিক অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সফর করে) "আর এক দল আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে" আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[৯]

আল্লামা যাইলায়ী 'তাখরীজুল আহাদীস ওয়াল আসার আল ওয়াকেয়া ফি তাফসীরিল কাশ্শাফি লিয্ যামাখশারী' নামক গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সা'লাবী তার তাফসীরে মাআফী ইবন ইমরান থেকে তিনি ফারকাদে সাবাখী থেকে, তিনি ইব্রাহীম ইবন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০] উল্লেখ্য যে, 'ফারকাদে সাবাখী' একজন দুর্বল রাবী। আর সুয়ূতী 'আদদুর্‌রুল মানসুরে' তা ইবন মারদাওয়াইহ্ বর্ণনা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন।[১১]

এ হাদীসের আগের হাদীসটি মারফু অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি একটি মাওকুফ হাদীস অর্থাৎ ইবন মাসউদের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আগের হাদীসে বলা হয়েছে, হাদীসটি মারফু হিসেবে সহীহ নয়। সুতরাং উভয়টি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বক্তব্য হতে পারে।

উপর্যুক্ত হাদীস দুটিতে পণ্য আমদানিকারক শাহাদতের মর্যাদা লাভের জন্য তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে। তার প্রথম শর্তটি হলো : কোন মুসলিম দেশে পণ্য আমদানি করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলো : কষ্ট সহ্য করে এবং ধৈর্য ধারণ করে পণ্য আমদানি করতে হবে। আর তৃতীয় শর্তটি হলো : এ আমদানির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সওয়াব পাবে; এ আশায় পণ্য আমদানি করতে হবে। আর সবগুলো হাদীসে চতুর্থ যে শর্তটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো : আমদানিকৃত পণ্য সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করতে হবে, তাহলেই আল্লাহর কাছে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করা যাবে ।

ইবন মাসউদ রা. থেকে অপর এক হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বাহির থেকে খাদ্যপণ্য নিয়ে আসে অতঃপর তা সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করলো

---

৯ . আবু মুহাম্মাদ আল হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাবী, *মাআলিমুত তানযীল ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারীম,* (তাফসীরে বাগাবী) বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাস আল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি:, খ. ৮, পৃ. ২৫৮

عن ابن مسعود قال: أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسبًا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله: "وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" [يعني المسافرين للتجارة يطلبون رزق الله] "وآخرون يقاتلون في سبيل الله"

১০. জামালুদ্দীন আয-যাইলায়ী, *তাখরীজুল আহাদীছি ওয়াল আছারিল ওয়াকি'আতি ফী তাফসীরিল কাশশাফ লিয-যামাখশারী,* রিয়াদ : দারু ইবনু খুযাইমাহ, ১৪১৪ হি., খ. ৪, পৃ. ১১১

১১. মুহাম্মাদ আল গাযালী, *ইহইয়ায়ূ উলূমুদ্দিন, ওয়া মা'হু তাখরীজুল হাফিয আল ইরাকী,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭০

www.pathagar.com

সে যেন তা সাদকাহ করলো'। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'সে যেন একটি গোলাম আযাদ করলো'।[১২]

আল্লামা ইরাকী ইহইয়ায়ু উলূমুদ্দীনের টীকায় বলেন, এ হাদীসটি ইবন মারদাওয়াইহ তার তাফসীরে ইবন মাসউদ রা. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৩] এসব হাদীস দুর্বল হলেও মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মতে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য। বিশেষত এর পক্ষে যেহেতু পবিত্র কুরআনের আয়াত আছে সেহেতু তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

এ হাদীস মতে, বাহির থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে তা বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করলে সাদকাহ করার বা গোলাম আযাদ করার মত সওয়াব পাওয়া যায়। তবে এ সওয়াব পাওয়ার জন্য শর্ত হলো, পণ্য সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী বিক্রি করতে হবে। পণ্য আটকিয়ে রেখে বেশি দামে বিক্রি করলে এ সওয়াব পাওয়া যাবে না; বরং এ জন্য গুনাহগার হতে হবে।

এবার ইসলামী ব্যাংক কিভাবে আমদানি রপ্তানিকারকদের শরীয়াহ সম্মতভাবে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে অর্থ আয় করতে পারে; সে বিষয়ে আলোচনা করি। আমাদের জানা মতে, ইসলামী ব্যাংকগুলো আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে আয় করতে পারে।

ক. আমদানি কর্মে ব্যাংকিং সেবা ও মুনাফা অর্জন

বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে চাইলে বা বিদেশে পণ্য রপ্তানি করতে চাইলে বর্তমান যুগে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে ব্যাংকে ঋণপত্র বা 'এল সি' (L.C. Letter of Credit]) খুলতে হয়। 'এল সি' খোলা ছাড়া বর্তমান যুগে সাধারণত আমদানি-রপ্তানি করা যায় না।

আমাদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের কাজ শুরু হয় আমদানিকারক কর্তৃক ব্যাংকে 'এল সি' খোলার মাধ্যমে। 'এল সি' কী? 'এল সি' কেন খুলতে হয়? আমরা এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করছি।

'এল সি' হলো : আমদানিকারকের পক্ষ থেকে তার ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারককে দেয়া একধরনের শর্তযুক্ত প্রতিশ্রুতি। 'এল সি' এর মাধ্যমে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে,

---

[১২]. আবুল ফযল আল ইরাকী, *আল্ মুগনী আন হামলিল আসফারি*, রিয়াদ : মাকাতাবা তাবারারিয়া, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, তৃতীয় অধ্যায়, ফি বায়ানিল আদল, খ. ১, পৃ. ৪২২, হাদীস নং- ১৬০১
عن ابن مسعود قال: "من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به" وفي لفظ آخر "
فكأنما أعتق رقبة "

[১৩]. মুহাম্মাদ আল গাযালী, *ইহইয়ায়ূ উলুমুদ্দিন ওয়া মাআহু তাখরীজুল হাফিয আল ইরাকী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭০

www.pathagar.com

রপ্তানিকারকের ব্যাংক যদি আমদানিকারকের ব্যাংকের কাছে রপ্তানি সংক্রান্ত নির্ধারিত ডকুমেন্ট উপস্থাপন করতে পারে; তবে আমদানিকারকের ব্যাংক রপ্তানিকারকের ব্যাংক-কে 'এল সি'-তে উল্লেখিত নির্ধারিত অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

বর্তমান যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য আদায় ও পরিশোধের জন্য 'এল সি' খোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ 'ঋণপত্র' বা 'এল সি' খোলার ফলে রপ্তানিকারক তার পণ্যের মূল্য পাওয়ার গ্যারান্টি পায়। আর আমদানিকারক তার পণ্য পাওয়ার গ্যারান্টি পায়। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তখন 'এল সি' খোলার কারণে গ্যারান্টার হয়ে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষের আস্থা বাড়ে, ঝুঁকি কমে। সাধারণত 'এল সি' বা লেটার অব ক্রেডিট নিম্নোক্ত চার পদ্ধতিতে খোলা হয় :

১. আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক 'এল সি' খোলা।
২. আমদানিকারক ও ব্যাংক কর্তৃক অংশীদারি ভিত্তিতে পণ্য আমদানির জন্য 'এল সি' খোলা।
৩. ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে সরবরাহ করার জন্য গ্রাহকের লাইসেন্স নিয়ে গ্রাহকের নামে নিজ উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থে পণ্য আমদানির জন্য 'এল সি' খোলা।
৪. আমদানিকারক কর্তৃক পণ্যের কোন নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা না রেখে 'এল সি' খোলা।

'এল সি' থেকে ইসলামী ব্যাংকের আয়

আমরা উপরে চার প্রকারের 'এল সি'র কথা আলোচনা করেছি। এই চার প্রকারের 'এল সি' থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো কিভাবে অর্থ আয় করতে পারে; এখানে তা আলোচনা করা হলো:

প্রথম পদ্ধতির 'এল সি'

প্রথমোক্ত 'এল সি' তথা আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক 'এল সি' খুললে; তখন ইসলামী ব্যাংকগুলো এ জন্য ট্রেডিশনাল ব্যাংকগুলোর মত সেবা মূল্য বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারে, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কারণ আমদানিকারক ব্যাংকে 'এল সি' খোলার সাথে সাথে ব্যাংক তার গ্যারান্টার বা কাফিল হয়ে যায়। ফলে ব্যাংক তার পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য থাকে। এই কাফালতের জন্য ব্যাংক শরীয়াহ মতে কোন সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ ইসলামী শরীয়াহ মতে কাফালত একটি সেবামূলক কাজ; এ জন্য পারিশ্রমিক নেয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে ফিকহবিদদের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো :

www.pathagar.com

ইবনে হুমাম 'ফাতহুল কাদীর'-এ বলেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, শুরুতে কাফালত একটি সেবামূলক চুক্তি হিসেবে থাকে, আর পরিশেষে বিনিময়মূলক চুক্তিতে পরিণত হয়'।[১৪] আল্ ফাতাওয়া আল ইকতিসাদিয়া-তে বলা হয়েছে, 'জুমহুর উলামার মতে কোম্পানী (ব্যাংক) পারিশ্রমিক নিতে পারে না। কারণ কাফালত এমন এক সেবামূলক চুক্তি যার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া শরীয়ত বিরোধী।[১৫]

ফিকহুল মুআমালাত-এ এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'উলামায়ে কিরাম এ মর্মে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, কাফালত একটি সেবামূলক চুক্তি, বিনিময়মূলক চুক্তি নয়'।[১৬]

মাজাল্লাতুল মাজমা আল ফিক্হিল ইসলামীতে বলা হয়েছে, 'ফিক্হ ইসলামীতে একথা প্রসিদ্ধ যে, কাফালত ঋণের মত একটি সেবামূলক চুক্তি, সুতরাং এর জন্য পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ নয়'।[১৭]

ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলীর ভিন্ন মত

তবে ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলীর মতে, আমদানিকারক পণ্যের সমস্ত মূল্য নগদ পরিশোধ করে 'এল সি' খুললে; তখন ব্যাংক কাফিল বা গ্যারান্টার থাকে না, বরং ব্যাংক হয়ে যায় ওয়াকিল। সুতরাং ব্যাংক ওকালতের জন্য সার্ভিস চার্জের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি তার বিখ্যাত 'আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু' নামক গ্রন্থে বলেন,

ব্যাংক গ্যারান্টি (সাধারণত) বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি লিখিত একটি অঙ্গীকার পত্র, যা কোন আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানিকারকের স্বার্থে কোন ব্যাংক 'এল সি'র নামে প্রদান করে। এ অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য হিসেবে যে মূল্য প্রাপ্য হন, তা পাওয়ার জন্য রপ্তানিকারক রপ্তানির কাগজপত্র ও পণ্য শীপমেন্টের প্রমাণপত্র ইত্যাদি 'এল সি'-র

---

১৪. কামাল উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ আস সাওয়াসী, (ইবনে হুমাম), *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৬, পৃ. ১৬২; (মাকতাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)

ولأبي حنيفة أنه أي عقد الكفالة عقد تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء

১৫. *আল ফাতাওয়া আল ইকতিসাদিয়া*, পৃ. ৪৮৬; (মাকতাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)

لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له.

১৬. মাজমুআতুন মিনাল মুয়াল্লিফীন, *ফিকহুল মুআমালাত*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৬

اتفق العلماء على أن الكفالة عقد تبرع لا معاوضة .

১৭. জাস্টিস তাকী উসমানী, আহকামুল বাই বিত তাকসীত ওয়া ওয়াসায়িলুহু, *মাজাল্লাতু মাজমা আল ফিক্হিল ইসলামী*, সংখ্যা : ১, খ. ৭, পৃ. ৬০২; (মাকতাবা শামিলা, ৩য় সংস্করণ)

ومن المعروف في الفقه الإسلامي أن الكفالة عقد تبرع كالقرض ، فلا يجوز تقاضي الأجرة عليها.

www.pathagar.com

শর্তানুযায়ী ব্যাংকে দাখিল করলে; তখন আমদানিকারকের পক্ষ হতে ব্যাংক পণ্য মূল্য তাকে আদায় করে দেয়ার অঙ্গীকার করে।

আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত মূল্য নগদ পরিশোধপূর্বক 'এল সি' খুললে, তখন তার হুকুম হলো : এমতাবস্থায় ব্যাংক 'এল সি' কারকের পক্ষ হতে ওয়াকিল হয়ে যায়, অন্য দিকে ব্যাংক পণ্য রপ্তানিকারক (অর্থাৎ 'মাকফুল লাহু') এর জন্য কাফিল বা গ্যারান্টার হিসেবে থাকে। সুতরাং ব্যাংক তার ওকালতির জন্য পারিশ্রমিক বা শ্রমমূল্য নিতে পারে। তবে গ্যারান্টার হবার জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে পারে না।[১৮]

ড. ওয়াহাবা আয-যুহাইলীর এ অভিমতের আলোকে বলা যায় যে, প্রথম প্রকারের 'এল সি'র ক্ষেত্রে ব্যাংক কাফিল নয়; বরং ওয়াকিল হবার কারণে সার্ভিস চার্জ ছাড়াও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির 'এল সি'

দ্বিতীয় পদ্ধতির 'এল সি'র ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে যৌথভাবে পণ্যের আমদানিকারক হয় সেহেতু এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে মুশারাকার বিধান অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নিতে পারে। তাছাড়া ব্যাংক 'এল সি' খোলা বাবত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করেও কিছুটা অতিরিক্ত আয় করতে পারে।

যেমন: কোন গাড়ী আমদানিকারক যদি গাড়ী আমদানি করার জন্য কোন ইসলামী ব্যাংকে 'এল সি' খুলতে আসে আর সে ২০ কোটি টাকার 'এল সি' খুলতে চায় কিন্তু তার মাত্র ১০ কোটি বা ১৫ কোটি টাকা ক্যাশ থাকে; আর বাকি ১০ বা ৫ কোটি টাকা সে ব্যাংকের বিনিয়োগ চায়; এমতাবস্থায় যে কোন ইসলামী ব্যাংক তাকে বলতে পারে, আমদানি কর্মে আমাদেরকেও অংশীদার করা হলে আমরা মুশারাকার ভিত্তিতে ১০ বা ৫ কোটি টাকা যোগান দিতে পারি। গাড়িগুলো আমদানির পর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ক্রেতা পাওয়া গেলে তখন ব্যাংকের পাওনা পাওয়ার শর্তে গাড়ী তাকে হস্তান্তর করা হবে। এ ভাবে মুশারাকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংক আয় করতে পারে।

---

[১৮]. ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলী, *আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেস্ক : দারুল ফিকর, ১০ম সংস্করণ, খ. ৬, পৃ. ৩৫; তার ভাষায়:

الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي يستعمل في تمويل التجارة الخارجية، وهو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمناً لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد، متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع، والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

وحكم الاعتماد المستندي المغطى غطاء كلياً يكون المصرف فيه وكيلاً عن فاتح الاعتماد، وإن كان كفيلاً بالنسبة للمصدّر الذي يعتبر مكفولاً له، وللمصرف أن يأخذ عمولة أو أجراً عن وكالته، لا عن كفالته.

www.pathagar.com

তৃতীয় পদ্ধতির 'এল সি'

আর তৃতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে গ্রাহকের লাইসেন্স নিয়ে তার নামে তার ফরমায়েশ মত পণ্য আমদানি করা হলেও প্রকৃত পক্ষে পণ্যের আমদানিকারক হলো ব্যাংক। কারণ ব্যাংকের অর্থে ব্যাংকের উদ্যোগেই পণ্য আমদানি করা হয়। সুতরাং এ অবস্থায় পণ্য আমদানির পর ব্যাংক গ্রাহকের কাছে 'বাই মুরাবাহা', 'বাই মুসাওয়ামা' (দরদাম করে মূল্য ঠিক করে) ও 'বাই মুয়াজ্জাল' ইত্যাদি পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রি করে বাজারদর অনুযায়ী লাভ করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক হবার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আইনী বাঁধা থাকার কারণে ব্যাংককে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের নামে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করতে হয়। ব্যাংক নিজের নামে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করতে পারে না। ফলে শরীয়াহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণেই ক্ষেত্র বিশেষে কিছু হারাম অর্থও কখনও ব্যাংকের কাছে চলে আসে, এরূপ ক্ষেত্রে হারাম টাকাগুলো ব্যাংকের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত না করে ইসলামী ব্যাংকগুলো তা ব্যাংক ফাউন্ডেশনে পাঠিয়ে দেয়। যা পরবর্তীকালে সাওয়াবের আশা না করে মানব সেবার কাজে ব্যয় করা হয়। কারণ কোন কারণে কারো কাছে হারাম অর্থ এসে গেলে তা সাওয়াবের আশা না করে সাদকাহ করে দেয়াই হলো ইসলামী শরীয়াহর বিধান।

চতুর্থ পদ্ধতির 'এল সি'

চতুর্থ আর এক প্রকারের 'এল সি' আছে যাতে আমদানিকারক 'এল সি' খোলার সময় ব্যাংকে আদৌ কোন নগদ অর্থ জমা রাখে না। ব্যাংকের কাছে কেবল এরূপ অঙ্গীকার করে যে, রপ্তানিকারক পণ্য শীপমেন্ট করার পর চাওয়া মাত্র সমস্ত মূল্য পরিশোধ করবে। এ অঙ্গীকারের গ্যারান্টি বাবদ জামানত স্বরূপ ব্যাংকে কিছু সম্পদ জমা বা বন্ধক রাখে।

এ ধরনের 'এল সি' প্রসঙ্গে ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলীর অভিমত হলো: 'যদি আমদানিকারক আমদানি পণ্যের আংশিক বা আদৌ কোন মূল্য পরিশোধ না করে 'এল সি' খোলে, তখন ব্যাংক হয় 'কাফিল' বা গ্যারান্টার। আর 'এল সি'কারক হন 'মাকফুল আনহু'। এমতাবস্তায় ব্যাংক তার সার্ভিসের জন্য নয়; বরং গ্যারান্টার হবার জন্য পারিশ্রমিক নিলে তা হবে কাফালতের বিনিময় গ্রহণ, যা বৈধ নয়'।[১৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের 'এল সি'র ক্ষেত্রে আমদানিকারক মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করলে সুদী ব্যাংকগুলো 'এল সি'র শর্তানুযায়ী নিজস্ব ফান্ড বা তহবিল হতে

---

[১৯]. ড. ওয়াহাবা আয যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৫ তার ভাষায়:
أما في الاعتماد غير المغطى كليا أو جزئيا، فالمصرف كفيل، وفاتح الاعتماد غير المغطى مكفول عنه، فإذا أخذ المصرف عمولة مقابل المبلغ المكفول به، لا مقابل العمل الذي يقوم به، فقد أخذ أجرا مقابل الكفالة ذاتها، وهو لا يجوز

www.pathagar.com

পণ্যমূল্য পরিশোধ করে দেয়, অতঃপর আমদানিকারকের কাছ থেকে সুদসহ সমস্ত প্রদেয় মূল্য আদায় করে নেয়।

ইসলামী ব্যাংকগুলো উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে সাধারণত 'এল সি' বা ঋণপত্র খোলে না। কারণ উক্ত পদ্ধতিতে ঋণপত্র খোলা হলে; সেবাদানের জন্য সেবামূল্য বা সার্ভিসচার্জ গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়াহ মতে বৈধ হলেও আমদানিকারক মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করলে তখন ব্যাংক নিজ ফান্ড হতে পণ্যমূল্য পরিশোধ করে দিলে, ইসলামী শরীয়াহ মতে ব্যাংকের দেয়া টাকা আমদানিকারকের পক্ষে ব্যাংকের ঋণ বলে পরিগণিত হয়। আর ঋণের উপর কোন ধরনের লাভ নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ।[২০] কাজেই এ পদ্ধতিতে সুদ প্রবেশ করার কারণে ইসলামী ব্যাংক এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকগণের আল ওয়াদিয়া, মুশারাকা ও মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদেয় টাকা এভাবে ব্যাংক সুদে বা বিনা সুদে কর্জ হাসানা হিসেবে ঋণ দিতে পারে না।

মুদারাবা ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রস্তাবনা

আমাদের ধারণায় ইসলামী ব্যাংকগুলো এই চতুর্থ পদ্ধতির 'এল সি'র ক্ষেত্রে মুদারাবার ভিত্তিতে আমদানি কর্মে সহযোগিতা করে অর্থ আয় করতে পারে। যেমনঃ 'এল সি' খোলার পর যে কোন ইসলামী ব্যাংক আমদানিকারকের কাছে তার আমদানি ব্যবসায় মুদারাবা মুকাইয়্যেদা'র ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দিতে পারে। আমদানিকারক রাজি হলে ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে একটি 'মুদারাবা মুকাইয়্যেদা'র চুক্তি সম্পাদন করবে। চুক্তির সময় ব্যাংক মুদারিবের উপর ব্যাংকের অনুকূলে তার বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থ মুনাফাসহ ফিরে পাওয়ার জন্য নানা শর্ত আরোপ করবে। অতঃপর নিজ অর্থায়নে পণ্য আমদানি করবে। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারকের সাথে 'মুদারাবা মুকাইয়্যেদা'র চুক্তি থাকার কারণে এবং আমদানির যাবতীয় কর্মকাণ্ড ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হয় বলে ব্যাংকের ঝুঁকিও কম থাকে। তবে পণ্য দেশে পৌঁছার পর ব্যাংক পূর্বে আরোপিত শর্ত অনুযায়ী পণ্য নিজের আওতায় রাখবে; এমতাবস্থায় মুদারিব ক্রেতা পেলে তখন ব্যাংক তার মূল্য পাওয়ার গ্যারান্টি নিয়ে মুদারিবের কাছে পণ্য হস্তান্তর করবে। মুদারিবের সাথে ক্রেতার লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করার শর্তারোপও ব্যাংক চাইলে করতে পারে।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মুদারিবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দখলে পণ্য না যাওয়া পর্যন্ত মুদারিবের জন্য তা বিক্রি করা বৈধ হবে না। সুতরাং তা আগে তার

---

২০. ইবনে হাজার আল আসকালানী, *আল মাতালিব আল আলিয়া বি যাওয়াইদি আল মাসানীদ আস সামানিয়া*, সম্পাদনায় ড. সা'দ ইবন নাসির, অনুচ্ছেদ : আয যাজারু আনিল কারাদি ইযা জাররা মানফাআতান, সাউদি আরব : দারুল আসিমা, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হিঃ, খ.৭, পৃ. ৩৬২
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

www.pathagar.com

দখলে নিয়ে যেতে হবে। কারণ হাকীম ইবন হিযাম থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যা কব্জা বা দখলে নাওনি তা কখনো বিক্রি করবে না।"[২১] অপর এক বর্ণনায় আছে, "তোমার কাছে যা নাই তা বিক্রি করো না।"[২২] তবে মুদারিব ক্রেতার সাথে বিক্রয়ের কথা পাকাপোক্ত করতে পারবে। এমতাবস্থায় পণ্য তার দখলে আসলে তখন বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

খ. রপ্তানি কর্মে ব্যাংকিং সেবা ও মুনাফা অর্জন

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পণ্য আমদানির মত পণ্য রপ্তানি করার জন্যও রপ্তানিকারকের অর্থের প্রয়োজন হয়। বর্তমান যুগে সাধারণত একজন রপ্তানিকারকের কাছে রপ্তানির পণ্য তৈরি করা অবস্থায় থাকে না। সে যখন পণ্য রপ্তানির কোন অর্ডার পায় তখনই পণ্য তৈরি করে। আর তখন তার পণ্য তৈরির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই সে অর্থের জন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত রপ্তানিকারকদের দুই রকমের অবস্থা হয়ে থাকে। যথা:

১. কখনও রপ্তানিকারকের কাছে কিছু অর্থ থাকে কিন্তু সে অর্থ পণ্য তৈরি ও শীপমেন্টের জন্য পর্যাপ্ত নয়।
২. কখনও তার কাছে পণ্য তৈরি ও শীপমেন্টের জন্য আদৌ কোন অর্থ থাকে না।

এই দুই অবস্থায় রপ্তানিকারককে অর্থ সহায়তা দান করাকে আধুনিক যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার ভাষায় 'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং' বলা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী শরীয়ত মতে কিভাবে 'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং' করতে পারে তা আমরা এখানে আলোচনা করছি।

প্রথমাবস্থায় এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং

যখন রপ্তানিকারকের কাছে কিছু অর্থ থাকে কিন্তু সে অর্থ পণ্য তৈরি ও শীপমেন্টের জন্য পর্যাপ্ত না হয়; তখন রপ্তানিকারক ব্যাংকের কাছে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং কামনা করলে; ব্যাংক তাকে নানা ভাবে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করতে পারে।যথা:

১. মুশারাকার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং : যদি রপ্তানিকারকের কাছে কিছু অর্থ থাকে কিন্তু সে অর্থ পণ্য তৈরি ও শীপমেন্টের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, এমতাবস্থায় সে

---

[২১]. সুলাইমান ইবনু আহমাদ আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, আল-মাওসিল : মাকতাবাতুল উম্ম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৩, খ. ৩, পৃ. ১৯৬, হাদীস নং-৩১০৭
عَنْ حَكِيمَ بن حِزَامٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَبِيعُ بُيُوعًا كَثِيرَةً ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : " لا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ "

[২২]. ইমাম আবু-দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : ফি রজুলি ইয়াবিউ মা লাইসা ইনদাহু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১৪৮৩, হাদীস নং- ৩৫০৩
عن حكيم بن حزام قال يارسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق ؟ فقال " لا تبع ما ليس عندك "

www.pathagar.com

ব্যাংকের কাছে অর্থ সহযোগিতা চাইলে; তখন ব্যাংক তাকে মুশারাকার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং এর প্রস্তাব দিতে পারে। যেমন: কোন গার্মেন্টস কোম্পানী বা অন্য কোন পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কাছে এসে পণ্য তৈরির জন্য কিছু অর্থ চাইলো; তখন ব্যাংক কোম্পানীকে তার রপ্তানি ব্যবসায় ব্যাংককেও শরীক করে নেয়ার প্রস্তাব দিতে পারে। কোম্পানী ব্যাংকের প্রস্তাব গ্রহণ করলে; তখন মুশারাকা'র ভিত্তিতে পণ্য তৈরির জন্য ব্যাংক কোম্পানীকে অর্থ যোগান দিতে পারে। এ পদ্ধতিতে কোম্পানী ও ব্যাংক পণ্য রপ্তানি করে যা লাভ করবে তা উভয়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নিয়ে ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়েই লাভবান হতে পারে। এ ভাবে ব্যাংক মুশারাকা ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে যা আয় করে; তা ব্যাংকের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। কারণ এ আয় নিরেট হালাল ব্যবসা থেকে অর্জিত।

২. বাই সালাম এর ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং : নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বাই সালাম এর ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করা যেতে পারে। যথা: কোন রপ্তানিকারক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান যখন পণ্য রপ্তানির কোন অর্ডার পায়, তখন পণ্য উৎপাদন করার মত কাঁচামাল তার কাছে না থাকলে তা বাজার থেকে কেনার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ তার কাছে না থাকলে; তখন সে কোম্পানী ব্যাংকের কাছে অর্থের জন্য আসে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক তাকে 'বাই সালাম' এর ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করার প্রস্তাব দিতে পারে। বলতে পারে "আমাকেও আপনার সাথে পণ্য রপ্তানিকারক হবার সুযোগ দিন, আমি আপনাকে 'বাই সালাম' এর ভিত্তিতে বাকি প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিব"। এমতাবস্থায় কোম্পানী ব্যাংককেও পণ্য রপ্তানিকারক হবার সুযোগ দিলে ব্যাংক কোম্পানীর কাছ থেকে 'বাই সালাম' এর ভিত্তিতে আগাম কিছু পণ্য যথা : অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ ক্রয় করতে পারে। এভাবে কোম্পানীর কাছ থেকে আগাম কিছু পণ্য ক্রয় করা হলে; কোম্পানী আগাম পণ্যমূল্য পেয়ে পণ্য তৈরির কাঁচামাল বাজার থেকে কিনে যথাসময়ে পণ্য তৈরি করে, ব্যাংকের কাছে ব্যাংকের ক্রয়কৃত পণ্য হস্তান্তর করতে পারে। অতঃপর ব্যাংক তা নিজের দখলে নিয়ে এসে কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৩. বাই ইস্‌তিসনার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং : 'বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতেও নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করা যেতে পারে। যথা: যদি কোন বিদেশী আমদানিকারক বাংলাদেশ হতে গার্মেন্টস পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশের কোন রপ্তানিকারক কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গার্মেন্টস পণ্যের অর্ডার দেয়, যেমন: দশ হাজার পিচ শার্ট বা বিশ হাজার পিচ প্যান্টের অর্ডার দিল। তখন কোম্পানীর কাপড় সূতা বোতাম ইত্যাদি পণ্য তৈরির উপকরণ ক্রয়ের জন্য নগদ পুরো অর্থ না থাকলে তখন যদি ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়; তখন ব্যাংক বলতে পারে আমাকেও

www.pathagar.com

আপনার সাথে রপ্তানিকারক হবার সুযোগ দিন। আমি দশ হাজার পিচ শার্ট আপনার কাছ থেকে 'বাই ইসতিসনা' এর ভিত্তিতে ক্রয় করার জন্য অর্থ যোগান দিব। অতঃপর ব্যাংক পণ্য রপ্তানিকারক কোম্পানীকে পাঁচ হাজার পিচ শার্ট তৈরির জন্য 'বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতে অর্ডার দিয়ে আগাম মূল্য পরিশোধ করতে পারে। অতঃপর পণ্য তৈরি হলে তা ব্যাংক গ্রহণ বা কজা করে নিজের দখলে নিয়ে এসে কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে রপ্তানি করে অর্থ আয় করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান দশ হাজার পিচ শার্টের অর্ডার পেল; প্রতিটি শার্ট এর মূল্য পাঁচ ডলার। কিন্তু দশ হাজার পিচ শার্ট তৈরি করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ তার কাছে নেই। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটি অর্থের জন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হলে ব্যাংক তার কাছ থেকে তার চাহিদা মাফিক যথা: দু'হাজার পিচ শার্ট ৪ ডলার ৫০ সেন্টে বাই ইস্‌তিস্‌নার ভিত্তিতে অগ্রিম কিনে নিতে পারে। অতঃপর তার সাথে যৌথভাবে রপ্তানি করে অর্থ আয় করতে পারে। এ ভাবে পণ্য রপ্তানি করে প্রতি পিচ শার্ট থেকে ৫০ সেন্ট লাভ করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

দ্বিতীয় অবস্থায় এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং

আর যদি রপ্তানিকারকের পণ্য তৈরি ও শীপমেন্টের জন্য আদৌ কোন অর্থ না থাকে; এমতাবস্থায় রপ্তানিকারক ব্যাংকের কাছে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং কামনা করলে; ব্যাংক তাকে এমতাস্থায়ও নানা ভাবে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করতে পারে।

১. মুদারাবার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং: যদি কোন রপ্তানিকারক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানির কোন অর্ডার পায়, আর তখন পণ্য উৎপাদন করার মত কোন অর্থ তার কাছে না থাকে; আর সেই কোম্পানী ব্যাংকের কাছে অর্থের জন্য আসে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলো তাকে মুদারাবার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করার প্রস্তাব দিতে পারে। বলতে পারে আমাকেও আপনার সাথে রপ্তানিকারক হবার সুযোগ দিন; আমি আপনাকে পণ্য তৈরি ও শীপমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ 'মুদারাবার' ভিত্তিতে যোগান দিব। এমতাবস্থায় কোম্পানী ব্যাংককে পণ্য রপ্তানিকারক হবার সুযোগ দিলে ব্যাংক কোম্পানীকে অর্থ যোগান দিবে আর কোম্পানী পণ্য তৈরি করবে। কেননা মুদারাবায় এক পক্ষ পুঁজি ও অপর পক্ষ শ্রম যোগান দেয়। অতঃপর কোম্পানী পণ্য উৎপাদন করে তা রপ্তানি করবে। এভাবে মুদারাবার ভিত্তিতে ফাইন্যান্সিং করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

২. 'বাই সালাম' বা 'বাই ইসতিসনা'র ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং: যখন কোন বিদেশী আমদানিকারক বাংলাদেশ হতে গার্মেন্টস পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশের কোন রপ্তানিকারক কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গার্মেন্টস পণ্যের অর্ডার দেয়,

www.pathagar.com

যেমনঃ দশ হাজার পিচ শার্ট, বা বিশ হাজার পিচ প্যান্টের অর্ডার দিল। তখন কোম্পানীর কাছে কাপড় সূতা বোতাম ইত্যাদি পণ্য তৈরি করার উপকরণ ক্রয়ের জন্য কোন নগদ অর্থ না থাকলে; এমতাবস্থায় যদি কোম্পানী ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়; তখন ব্যাংক বলতে পারে আমাকেই রপ্তানিকারক হবার সুযোগ দাও। আমি দশ হাজার পিচ শার্ট তোমার কাছ থেকে 'বাই ইসতিসনা' বা 'বাই সালামে'র ভিত্তিতে ক্রয় করে তোমাকে পণ্য তৈরি করার জন্য আগাম অর্থ যোগান দিব। তখন উৎপাদক কোম্পানী আর ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে পণ্য রপ্তানির অর্ডারটি ব্যাংকের অনুকূলে নিয়ে যেতে পারে। অতঃপর ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে পণ্য রপ্তানির সকল কার্যক্রম চূড়ান্ত করে উৎপাদক কোম্পানীকে 'বাই ইসতিসনা' বা বাই সালাম' এর ভিত্তিতে পণ্য তৈরির জন্য অর্ডার দিয়ে আগাম অর্থ যোগান দিতে পারে। অতঃপর পণ্য তৈরি হলে; তা ব্যাংক গ্রহণ বা কব্জা করে নিজের দখলে নিয়ে এসে নিজ উদ্যোগে রপ্তানি করে অর্থ আয় করতে পারে।

পোস্ট শীপমেন্ট ফাইন্যান্সিং

'পোস্ট শীপমেন্ট ফাইন্যান্সিং' হলো : যখন কোন রপ্তানিকারক কোম্পানী অর্ডারকৃত পণ্য শীপমেন্ট করে পাঠিয়ে দেয়; আর তার নিজের কাছে পণ্যের মূল্য বাবদ বিল (Bill) মেমো রেখে দেয়; এমতাবস্থায় নতুন শীপমেন্টের জন্য তার টাকার প্রয়োজন হলে -বিলের টাকা পেতে কিছু দিন সময় লাগার কারণে- সে ব্যাংকের কাছে গিয়ে বলে, আমার এই বিল আপনার কাছে রেখে দিন। অতঃপর বিলের টাকা আপনি নির্দিষ্ট তারিখে যথাঃ দুই মাস পর বা তিন মাস পর আদায় করে নিবেন; আর আমাকে এখন বিলের টাকার চেয়ে কিছু কম টাকা দিবেন। যথাঃ বিল ১,০০০০০/=টাকার হলে সে ৯৫,০০০/= বা ৯০,০০০/= টাকা চায়। এমতাবস্থায় ব্যাংক তাকে ৯৫ বা ৯০ হাজার টাকা দিয়ে 'বিল ডিসকাউন্টিং' (Bill Discounting) করলে এই পুরো প্রক্রিয়াটিই হলো 'পোস্ট শীপমেন্ট ফাইন্যান্সিং'।[২৩] এটাকে বিল বাট্টাকরণও বলা হয়। ইসলামী ব্যাংক এভাবে বিল বাট্টা করতে পারে না। কারণ এভাবে বিল বাট্টা করা হলে তাতে সুদের আগমন হয়।

(Bill Discounting) বা বিল বাট্টা করে অর্থ আয়

প্রচলিত ব্যাংকিং-এ অর্থ আয়ের আর একটি খাত হলো (Bill Discounting)বা 'রপ্তানি বিল বাট্টাকরণ'। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা দানের জন্য সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো সুদের ভিত্তিতে রপ্তানি বিল বাট্টা করে থাকে অর্থাৎ কম

---

[২৩]. জাস্টিস তাকী উসমানী, *ফেকহী মাকালাত*, সম্পাদনাঃ মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্য়া, ঢাকা : বিশ্ব কল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০১০, পৃ. ৮০

www.pathagar.com

দামে বিলগুলো কিনে নেয়। সুদি ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদ আদায় করে। ফলে ব্যাংক লাভবান হলেও রপ্তানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ বিল বাট্টাকরণ একটি নিরেট সুদি কারবার বলে পরিগণিত। আসলে বিল হচ্ছে ঋণের পরিবর্তে একটা ডকুমেন্ট। যাতে লেখা থাকে, আগামী তিন মাস পর বা আগামী অমুক তারিখের পর এ বিল পরিশোধ করা হবে। সাধারণত যার কাছেই এ বিল থাকে তাকেই ঋণের পাওনাদার বলে পরিগণিত করা হয়। এ কারণেই অনেকেই নগদ টাকার প্রয়োজন হলে এ বিল বিক্রি করে দেয়।

ইসলামী শরীয়াহ মতে এ বিল অন্য কারো কাছে বিক্রি করার ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু নেই। কারণ তাকে শরীয়াহর পরিভাষায় 'হাওয়ালা' বলা হয়। আর হাওয়ালার বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। ইমাম বুখারী "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জনৈক ব্যক্তির উপর ঋণ থাকার কারণে তার জানাযার সালাত পড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, অতঃপর সাহাবী আবু কাতাদাহ রা. কর্তৃক তা আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ" থেকে হাওয়ালার বৈধতা প্রমাণ করেন।[২৪] তবে ইসলামী শরীয়াহর বিধান মতে হাওয়ালা বৈধ হলেও বিক্রি অবশ্যই সমমূল্যে হতে হবে। বেশ-কম করে বিক্রি করলে অতিরিক্ত অংশটুকু অবশ্যই সুদ বলে গণ্য হবে। কারণ বিল বিক্রি মানে আসলে প্রাপকের প্রাপ্য ঋণের বিপরীতে তাকে ঋণ দান করা। কাউকে ঋণ দিয়ে সে ঋণের উপর থেকে অতিরিক্ত কিছু উপকার লাভ করাই হলো সুদ। যেমন: ক. খ. এর কাছে দশ হাজার টাকা ঋণ পাবে। ঋণ পরিশোধের কথা তিন মাস পর। এমতাবস্থায় ক. গ.কে বলল, আমি খ.এর কাছে যে দশ হাজার টাকা ঋণ পাব তা তুমি তিন মাস পর নিও, আর এখন আমাকে তুমি নয় হাজার পাঁচশত টাকা দাও। এমতাবস্থায় গ. ক. কে যদি সাড়ে নয় হাজার টাকা দিয়ে পরে দশ হাজার টাকা গ্রহণ করে; তাহলে তার এ দশ হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ শত টাকা অবশ্যই সুদ গণ্য হবে।

---

২৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-হাওয়ালাহ, অনুচ্ছেদ : ইযা আহালা দাইনাল মায়্যিতি আলা রজুলিন জামা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং-২২৮৯

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لاَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

www.pathagar.com

একারণেই ইসলামী ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য ইসলামী ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণের বিকল্প ইসলামী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের তারল্য সংকট মোকাবিলা করার জন্য এ ক্ষেত্রে সাধারণত 'বাই সালাম' বা 'বাই ইসতিসনা' বা 'মুশারাকা'র ভিত্তিতে আগাম শীপমেন্টের অর্থ যোগান দেয়। ফলে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীগণ পণ্য শীপমেন্টের জন্য তারল্য সংকটে পড়ে না। অন্যদিকে ব্যাংকগুলোও এসব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল অর্থ আয় করতে পারে।

জাস্টিস তাকী উসমানীর মতে, অন্য ভাবেও ইসলামী পদ্ধতিতে বিল বাট্টা করা যায়। তার মতে, দুই ভাবে বিল ডিসকাউন্টিং এর পদ্ধতি বৈধ।

এক. এক্সপোর্টার যে পণ্যকে পোস্ট শীপমেন্ট ফাইন্যান্সিং করার মনস্থ করেছে ঐ শীপমেন্ট পণ্য পাঠাবার পূর্বে ব্যাংকের সঙ্গে মুশারাকার ভিত্তিতে শেয়ার করে নেবে।

দুই. এক্সপোর্টার ইমপোর্টারের কাছে পণ্য পাঠাবার পূর্বে কোন ব্যাংক বা অর্থ সংস্থার কাছে 'এল সি' এর মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রি করে দিবে। আর এ উভয় মূল্যের মধ্যে যে ব্যবধান হয় তাতেই ব্যাংকের লাভ হবে। যেমন: ১,০০০০০/= (এক লাখ) টাকার 'এল সি' খুলবে। এক্সপোর্টার ব্যাংককে উক্ত পণ্য ৯৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিবে। আর ব্যাংক ইমপোর্টারের কাছে এক লাখ টাকায় বিক্রি করবে। এতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকের লাভ হবে।

তবে এ দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তখন সম্ভব যখন ইমপোর্টারের সঙ্গে প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত না হবে; বরং শুধু 'এগ্রিমেন্ট টু সেল' বা বিক্রয়ের অঙ্গীকার হবে। আর যদি ইমপোর্টারের সাথে প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়, তবুও এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে উভয় অবস্থাতেই 'এক্সপোর্টার' নিজের ব্যবহৃত পুঁজি (ব্যাংক বা অর্থ সংস্থা থেকে) দ্রুত আদায় করে নিবে। নির্ধারিত সময় আসার অপেক্ষা তাকে করতে হবে না। অবশ্য বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে 'বিল ডিসকাউন্টিং' (Bill Discounting) -এর যে পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তা শরীয়ত সম্মত নয়।

'বিল ডিসকাউন্টিং'-এর ধারায় একটি বৈধ দিকও রয়েছে। কিছু শর্ত সাপেক্ষে এর উপরও আমল করা যাবে। কিন্তু সাধারণত ঐ সব শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তাই 'বিল ডিসকাউন্টিং'-এর বৈধ পদ্ধতির উপরও আমল করার অনুমতি নেই। তবে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত শর্ত সাপেক্ষে এ বৈধ পন্থার উপর আমল করতে চায়, তা হলে যে ব্যক্তি 'বিল ডিসকাউন্টিং' করতে চায় সে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাংকের সঙ্গে দুটি লেনদেন করবে।

www.pathagar.com

এক. 'এক্সপোর্টার''ইমপোর্টার' থেকে পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য ব্যাংককে এ শর্তে এজেন্ট নির্ধারণ করবে যে, ব্যাংক 'ইমপোর্টার' থেকে মূল্য আদায়ের ভিত্তিতে এক্সপোর্টার থেকে তার পক্ষে কাজ করার জন্য চার্জ আদায় করে নিবে।

দুই. ব্যাংক 'এল সি' এর মূল্য থেকে কিছু কম মূল্যে এক্সপোর্টারকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক্সপোর্টার যে 'বিল ডিসকাউন্ট' করতে চায় তা এক লাখ টাকা। এখন এক্সপোর্টার ব্যাংকের সঙ্গে দু'ভাবে লেনদেন করতে পারবে।

ক. এক্সপোর্টার ব্যাংককে তার এজেন্ট বানিয়ে বলবে, আপনি এ বিল ইমপোর্টার থেকে আমাকে আদায় করে দিবেন, আমি এ জন্য আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা সারচার্জ হিসেবে দিব।

খ. এক্সপোর্টার ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার টাকা সুদবিহীন কর্জ নিবে এবং ব্যাংককে বলবে, যখন আমার বিল আপনি ইমপোর্টার থেকে আদায় করবেন; তখন তা থেকে আপনার ৯৫ হাজার টাকা নিয়ে নেবেন, আর বাকি পাঁচ হাজার টাকা নিবেন সারচার্জ হিসেবে।

উল্লিখিত বৈধ পন্থায় আমল করা সম্ভব, তবে এতে একটি শর্ত অবশ্য জরুরী। অন্যথায় এ লেনদেন শরীয়ত সম্মত হবে না। সে শর্তটি হলো, ব্যাংক বা অর্থ সংস্থা এক্সপোর্টারের পক্ষে কাজ করার 'সারচার্জ' হিসেবে যে মূল্য আপসে আদায় করবে তাকে বিল আদায়ের নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ চার্জ বিলের মেজোরিটি পার্সেন্ট গ্রেড থেকে রিলেটেড হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বিষয়টি এমন নয় যে, যদি বিল আদায়ের সময়সীমা তিন মাস হয়; তবে সারচার্জ বিল হবে চার হাজার টাকা। আর যদি বিল আদায়ের সময়সীমা হয় চার মাস, তবে সারচার্জ বিল হবে ছয় হাজার টাকা। অর্থাৎ বিল আদায়ের নির্দিষ্ট সময় কম বেশি হওয়া দ্বারা 'সারচার্জ' বিল কম বেশি হবে না। তবে কিছু সারচার্জ তো অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। এ শর্ত সাপেক্ষে উক্ত বৈধ পদ্ধতিতে লেনদেন করা শরীয়াহ্ সম্মত হবে।"[২৫]

উপসংহার

১. আমদানি রপ্তানি অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে জিহাদের আলোচনা ও আল্লাহর রিয্ক অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সফরের আলোচনা পাশাপাশি করে উভয় কাজকে প্রায় সমান মর্যাদাবান বলে জানিয়েছেন।

---

[২৫]. জাস্টিস তাকী উসমানী, *ফেকহী মাকালাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২

www.pathagar.com

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'যে আমদানিকারক বিদেশ হতে কোন মুসলিম দেশে খাদ্যপণ্য আমদানি করে, অতঃপর সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী তা বিক্রি করে, সে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে' বলে জানিয়েছেন।

৩. আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পণ্যের সমস্ত নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক 'এল সি' খুললে; তখন ইসলামী ব্যাংকগুলো আমদানিকারকের গ্যারান্টার বা কাফিল হয়ে যায়, এ জন্য সেবা মূল্য বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারে, তবে ড. ওহাবা আয-যুহাইলীর মতে, এ অবস্থায় ব্যাংক কাফিল নয়; বরং ওয়াকিল হবার কারণে সার্ভিস চার্জ ছাড়াও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে।

৪. আমদানিকারক ও ব্যাংক কর্তৃক অংশীদারির ভিত্তিতে পণ্য আমদানির জন্য 'এল সি' খুললে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে মুশারাকার বিধান অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

৫. ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে সরবরাহ করার জন্য গ্রাহকের লাইসেন্স নিয়ে গ্রাহকের নামে নিজ উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থায়নে পণ্য আমদানি করলে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে বাই মুরাবাহা, বাই মুসাওয়ামা, বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৬. আমদানিকারক কর্তৃক পণ্যের কোন নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা না রেখে 'এল সি' খুললে; তখন ব্যাংক আমদানিকারকের কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ যোগান দিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৭. এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং

ক. রপ্তানিকারকের কাছে কিছু অর্থ থাকলে তাকে মুশারাকা, বাই সালাম, বাই ইস্তিসনার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করে অর্থ আয় করতে পারে।

খ. আর রপ্তানিকারকের কাছে আদৌ কোন অর্থ না থাকলে তখন তাকে মুদারাবা, বাই সালাম, বাই ইসতিসনার ভিত্তিতে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করে অর্থ আয় করতে পারে।

৮. পোস্ট শীপমেন্ট ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে (Bill Discounting) বা বিল বাট্টা না করে গ্রাহকদের তারল্য সংকট মোকাবিলা করার জন্য বাই সালাম, বাই ইসতিসনা বা মুশারাকা ইত্যাদির ভিত্তিতে আগাম শীপমেন্টের জন্য অর্থ যোগান দিয়ে অর্থ আয় করতে পারে।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে মুসলিম জাতিকে সুদের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে, মানবজাতিকে ইনসাফপূর্ণ ও মানবিক একটি অর্থব্যবস্থা উপহার দিতে এবং মুসলিম জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের স্বার্থেই শুরু হয়েছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন করে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে অর্থ আয় করতে পারে; এ প্রবন্ধে ইতঃপূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে যেসব জাতি ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত, যারা অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ, তারাই সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ কারণেই মুসলিম জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে আরো বেশি করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বুঝার তাওফিক দিন। আমীন।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৩

কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ** : *মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করা মানুষের আজন্ম লালিত একটি স্বপ্ন। জগৎ সংসারে মা-বাবা হয়ে বংশধারার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মধ্যেই মানুষ জন্মের সার্থকতা খুঁজে। চিকিৎসা বিজ্ঞান সময়ে সময়ে মানুষের এ আবেগ-অনুভূতির আহবানে সাড়া দিয়ে চলছে, যার সর্বশেষ ধাপ হল কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী। এ গর্ভোৎপাদনের কাঁচামালের যোগান দেয়ার নিমিত্তে ইউরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে জন্ম নিয়েছে "Semen Banks" তথা শুক্রাণু ব্যাংকসহ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সরবরাহকারী অনেক প্রতিষ্ঠান। সেসব দেশে এ ব্যবস্থা সফল ও লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। মানুষের সন্তান লাভের কামনা-বাসনার প্রতি সাড়া দিতে গিয়ে মুসলিম দেশগুলোও এ বিষয়টিকে এড়াতে পারেনি। বিভিন্ন মুসলিম দেশেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে। একদিকে সন্তানের কামনা, অপরদিকে ধর্মের বিধি-বিধান, এ উভয়মুখী সংকট মুসলিম জগতের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভাবিয়ে তুলছে। কিন্তু জীবনের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের সুন্দর ও ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। প্রবন্ধে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী সম্পর্কে ইসলামের সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।*]

ভূমিকা

এ কথা সকলের নিকট সুস্পষ্ট যে ইসলামী আইনের আলোকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির দৈহিক মিলনের ফলেই স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন হয়ে থাকে। মানব সন্তান গর্ভে আসার ক্ষেত্রে চারটি স্তর অতিক্রম করে থাকে, এর কোনটিই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণত জরায়ুতে বীর্য পড়ার ফলেই সন্তান হয়ে থাকে। এর রয়েছে চারটি পর্যায়: বিবাহ অতঃপর মিলন, মিলনের পরে বীর্য পড়ার জন্য ধৈর্য্য ধারণ, সর্বশেষে বীর্য জরায়ুতে পড়া নিশ্চিত করার জন্য কিছুক্ষণ অবস্থান। এ চারটির প্রত্যেকটিই একটি অপরটির কাছাকাছি এবং এর একটি বাদ পড়ে গেলে গর্ভোৎপাদন নাও হতে পারে।[১] এর থেকে বুঝা গেল স্বামী স্ত্রীর মিলনের ফলে বীর্য (Semen) যদি জরায়ুতে গিয়ে পৌছে তাহলে গর্ভোৎপাদন হয়। গর্ভোৎপাদনে পুরুষাঙ্গের কাজ ডিম্বাণুকে

---

* এম. এম. (হাদীস), আল-আজহার গ্রাজুয়েট, চার্টার্ড ইসলামিক ফাইনান্স প্রফেশনাল (CIFP), পিএইচডি গবেষক, ইসলামী আইন ও ইসলামী ব্যাংকিং এন্ড তাকাফুল, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া, (IIUM)।

১. ইমাম গাযালী, *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন*, আল-কাহেরা : মাকাতাবাতু মিসর, ১৯৯৮, খ. ২, পৃ. ৫১

www.pathagar.com

(Ovum) নিষিক্ত করার জন্য বীর্য ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌছানো। বিশেষজ্ঞরা পুরুষাঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন 'শরীরের যে অঙ্গ বীর্যকে জরায়ু (Womb) পর্যন্ত পৌছাতে সহযোগিতা করে'। কখনো কখনো এ প্রক্রিয়া ছাড়াও বীর্য জরায়ু পর্যন্ত পৌছানো যায়।[২] বীর্যস্থ শুক্রাণু এবং মহিলার ডিম্বকোষস্থ (Ovum) ডিম্বাণুর পরাগায়নের মাধ্যমেই মানব সন্তান জন্ম লাভ করে। উল্লেখ্য যে, বীর্য পুরুষাঙ্গ থেকে নয়, বরং অণ্ডকোষ (Testicles) থেকে সৃষ্টি হয়।[৩] তাই মুসলিম স্কলারগণ পুরুষাঙ্গবিহীন মানুষের দিকে সন্তানকে সম্পৃক্ত করে থাকেন, যদি তার অণ্ডকোষ ঠিক থাকে এবং গর্ভোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকার কারণে তার স্ত্রীর উপর ইদ্দত[৪] পালন আবশ্যিক হয়। যেহেতু সৃষ্টির আসল হচ্ছে শুক্র এবং তার উৎস হচ্ছে অণ্ডকোষ। অপরদিকে পুরুষাঙ্গ ব্যতীত বীর্য প্রবিষ্ট বা নিক্ষেপ করা বা অন্য কোন মাধ্যমেও কারো জরায়ুতে পৌছাতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, স্বামী স্ত্রীর শুক্র এবং ডিম্বাণু মিলিত হওয়ার প্রাকৃতিক ও মৌলিক উপায় হচ্ছে দৈহিক মিলন যা মানব দেহের প্রাকৃতিক চাহিদার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

ইমাম গাযালী বর্ণিত উপরোক্ত চারটি পর্যায় যদি শারীরিক কোন সমস্যাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং স্বামীর শুক্র যদি স্ত্রীর ডিম্বাণুতে পৌছে তাহলে সাধারণত আল্লাহর অনুমতিতে প্রাকৃতিকভাবেই গর্ভোৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো সকল কিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে গর্ভোৎপাদন হয় না, চাই সম্ভাব্য সমস্যা স্বামীর মাঝে থাকুক বা স্ত্রীর মাঝে থাকুক। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গর্ভোৎপাদন না হওয়াকে বলা হয় গর্ভোৎপাদনে ঘাটতি থাকা বা সমস্যাগ্রস্ত হওয়া। কখনো কখনো

---

২. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ৩, পৃ. ৩৯৬

৩. কিন্তু কুরআনের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্যস্থল থেকে নির্গত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে, যা মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্যস্থল থেকে নির্গত হয়" (সূরা আত-তারিক: ৬-৭)

خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

যেহেতু যে উপাদান থেকে পুরুষ ও নারীর জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থিত ধড় থেকে বের হয়, তাই বলা হয়েছে পিঠ ও বুকের মধ্যস্থল থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের হাত-পা কর্তিত অবস্থায়ও এ উপাদান জন্ম নেয়। তাই এ কথা বলা ঠিক নয় যে, সারা শরীর থেকে এ উপাদান বের হয়। আসলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোই হচ্ছে এর উৎস। আর এ প্রধান অঙ্গগুলো সব ধড়ের সাথে সংযোজিত। মস্তিষ্কের কথা আলাদা করে না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের এমন একটি অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বজায় রয়েছে।

৪. মুসলিম নারী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর জরায়ুর গর্ভমুক্তির নিশ্চয়তার জন্য চার মাস দশ দিন বা তিন হায়েজ সময় অপেক্ষা করার নাম ইদ্দত।

www.pathagar.com

গর্ভোৎপাদনে ঘাটতি থাকা (Infertility) এবং বন্ধ্যাত্ব (Sterility) এ পরিভাষাদ্বয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হয়ে যায়, অথচ উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বন্ধ্যাত্বের কোন কোন পর্যায় এখনো চিকিৎসা জগতের নিকট দুর্ভেদ্য। যেমন: জন্মগত ও বংশগত রোগব্যাধি যা দেহের প্রজনন ব্যবস্থাপনাকে (Reproductive System) অকেজো করে দেয়, বিশেষ করে যৌনগ্রন্থিতে (Sex Gland) সমস্যার সৃষ্টি করে, অণ্ডকোষ না থাকা বা অতিশয় দুর্বল হওয়া অথবা ডিম্বাণু না থাকা বা ডিম্বাণু সৃষ্টি কম হওয়া এ জাতীয় অবস্থা যেগুলো মূলত ক্রোম্যাটিনে (Chromatin) সমস্যা থাকার কারণে হয়ে থাকে, অথবা যে কোন কারণে প্রজনন ব্যবস্থা (Reproductive System) নষ্ট হয়ে যাওয়া, এ সকল কারণেই বন্ধ্যাত্ব (Sterility) রোগ হয়ে থাকে। কিন্তু গর্ভোৎপাদনে ঘাটতি থাকা বলতে এমন সকল রোগব্যাধিকে বুঝায় যার চিকিৎসা করা সম্ভব।[৫] তাইতো আল-কুরআনের ভাষায় এ বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "আসমান যমীনের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন, এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা[৬] করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম",[৭] অর্থাৎ: এমন বন্ধ্যাত্ব যা চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে ওঠা সম্ভব নয়।[৮]

---

৫. ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার, *আখলাকিয়াত আত-তালকীহ আল-ইসতিনায়ী, নাযরাহ ইলাল জুযুর*, জিদ্দা : আদ্-দার আস-সাউদিয়্যাহ, ১৯৮৭, পৃ. ২৫-২৭

৬. বন্ধ্যাত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত, একটি ফায়সালা। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দান যাতে মানব জীবন যান্ত্রিক মেশিনে পরিণত না হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র মৌলিক উপাদান (স্বামী ও স্ত্রী) সংগৃহীত হলেই গর্ভোৎপাদন হয়ে যাবে এমন যাতে না হয়; বরং সবকিছু সংগৃহীত হলেও কখনো গর্ভোৎপাদন হবে, আবার কখনো হবে না। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অসীম কুদরতে পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে আ. সৃষ্টি করেছেন, হাওয়াকে আ. শুধুমাত্র পুরুষ তথা আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে ঈসাকে আ. পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং অবশিষ্ট মানব সন্তান মাতা-পিতা উভয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকেন। তাই বন্ধ্যাত্ব একটি খোদায়ী ফায়সালা, মানুষকে তা বুঝানোর জন্য যে গর্ভোৎপাদন কোন যান্ত্রিক কাজ নয়; বরং এটি একটি আসমানী সিদ্ধান্ত। তদুপরি গর্ভোৎপাদনকে আল্লাহ তাআলা সম্ভোগের সাথে সম্পর্কিত রেখেছেন। যদি স্ত্রীরা তাদের স্বামীর সাথে মিলনে দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি না পেত, তাহলে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে গর্ভোৎপাদন ও সন্তান প্রসব করতে খুব কম লোকই আগ্রহী হত। দেখুন: শাইখ মুহাম্মাদ শা'রাওয়ী, *মিম্বারুল ইসলাম*, মিসর : ওয়ারাতুল আওকাফ, মার্চ-১৯৯৭

৭. আল-কুরআন, ৪২ : ৪৯-৫০

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ،
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

৮. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআন আল-আজীম*, আল-কাহেরা : ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ১২১

www.pathagar.com

কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন (Artificial Insemination) বলতে বুঝায় এমন কিছু প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্বাভাবিক মিলন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা হয়। এ নিষিক্তকরণ কখনো অভ্যন্তরীণ তথা মহিলার গর্ভনালীতে হয়ে থাকে, আবার কখনো বাহ্যিক তথা টিউবে হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে তা মহিলার জরায়ুতে বপন করা হয়, তাই এটি 'টেস্ট টিউব বেবী' নামে পরিচিত।[৯] কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে অবশ্যই স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন না হওয়ার কারণ জানা এবং সমস্যা সনাক্ত করা ও এর সঠিক চিকিৎসা নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অস্ত্রোপচার, ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি যদি এ ক্ষেত্রে সফল না হয় তাহলে ডাক্তার রোগীর অনুমতিক্রমে কৃত্রিমভাবে গর্ভোৎপাদনের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ পর্যায়ে আমাদের স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন না হওয়ার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া এবং ডাক্তার কর্তৃক প্রয়োজনীয় গোপন স্থানগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণালাভ করা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী আইনের বিধান এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নেয়া আবশ্যক।

চিকিৎসা এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী আইনের বিধান

মুসলিম ফকীহদের[১০] নিকট এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, সকল রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন না হওয়াও এক ধরনের রোগ, যার চিকিৎসা করা বৈধ। কেননা স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে পুরুষ ও নারী একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছার পর গর্ভোৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করে বিবাহোত্তর মিলনের পরও যদি গর্ভোৎপাদন না হয় তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই কোন রোগ আছে যার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ সময় নিঃসন্তান রেখে পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা আল্লাহর নিকট এ রোগ থেকে মুক্তি কামনা করেছেন। হযরত যাকারিয়া আ. ও তাঁর সহধর্মিণী বার্ধক্যে পৌঁছার পর এবং গর্ভোৎপাদনের স্বাভাবিক

---

৯. সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, হুকমু আল-ইসলাম ফি আত-তালকীহ্ আস-সিনায়ী, *মাজাল্লাত আল-উলূম ওয়াল বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ*, জামেয়া আস-সূদান লিল উলূম ওয়া টেকনোলোজিয়া, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি-২০১১, পৃ. ৩

১০. মুহাম্মাদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন, *রাদ্দ আল-মুহতার আলা আদ-দুর আল-মুখতার আল-মারুফ বি হাশিয়া ইবনে আবেদীন*, তাহকীক : মুহাম্মাদ সাবহী ও অন্যান্য, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ১৯৯৮, খ. ৩, পৃ. ২১১; মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-হুমাম, *শরহে ফাতহুল ক্বাদীর*, আল-রিয়াদ : দারুল আলম আল-কুতুব, ২০০৩, খ. ৮, পৃ. ৪৬২, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৩; আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামাহ, *আল-মুগনী*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৯, খ. ৭, পৃ. ৪৫৯

www.pathagar.com

বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা করেছেন, যা থেকে তারা দীর্ঘ সময় বঞ্চিত ছিলেন।[১১] ইরশাদ হচ্ছে :

"ক্বাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। এটি তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন, যখন সে চুপিচুপি নিজের রবকে ডাকলো। সে বললো, হে আমার রব! আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যে সুশুভ্র হয়ে ওঠছে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কখনো তোমার নিকট দু'আ চেয়ে ব্যর্থ হইনি। আমি আমার পর নিজের স্বজন-স্বগোত্রীয়দের অসদাচরণের আশংকা করি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (তথাপি) তুমি নিজের বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে। আর হে পরওয়ারদিগার! তাকে একজন পছন্দনীয় মানুষে পরিণত করো"।[১২]

এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম আ. বার্ধক্য অবস্থায় আল্লাহর নিকট একটি নেক সন্তানের জন্য দু'আ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে: "প্রভু হে! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দান করুন। (এ দু'আর জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম"।[১৩] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: "প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। নিশ্চয় আমার রব দু'আ শ্রবণকারী"।[১৪]

রাসূলুল্লাহ স. হাদীস শরীফে প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। উসামা ইবনে শারীক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: বেদুঈন লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি চিকিৎসা করব না? রাসূলুল্লাহ স. বললেন: হ্যাঁ, তোমরা চিকিৎসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেন নাই যার জন্য আরোগ্য লাভের তথা ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই। তবে একটি মাত্র রোগ যার কোন চিকিৎসা নেই। তারা বলল, সেটা কী ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে

---

[১১]. জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আস সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, বৈরুত : দারুল আলম আল-কুতুব, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯৬

[১২]. আল-কুরআন, ১৯ : ১-৬

كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6).

[১৩]. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০০-১০১ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

[১৪]. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৯

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء

www.pathagar.com

বার্ধক্য।[১৫] রাসূলুল্লাহ স. অন্যত্র বলেন: "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন কোন রোগ দেন নাই যার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই"।[১৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে প্রমাণিত যে, নিশ্চয় প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। তাই ইসলামী আইনে রোগী ব্যক্তির যে কোন রোগের চিকিৎসা নেয়ার অনুমতি রয়েছে। শুধু তাই নয় প্রয়োজনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর জন্য হাদীস শরীফে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।[১৭] যায়েদ ইবনে আসলাম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে এক ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং আঘাতের স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তখন তার অবস্থা দেখার জন্য বনী আনমারের দু'জন লোক ডেকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমাদের মধ্যে চিকিৎসায় কে বেশী অভিজ্ঞ? তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ চিকিৎসায় কি কোন কল্যাণ আছে ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন: যিনি রোগ দিয়েছেন তিনিই নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন।[১৮] না জেনে কেউ যদি ডাক্তার দাবী করে ভুল চিকিৎসা করে কারো ক্ষতি করে তাহলে সে এর জন্য দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।[১৯] হযরত আমর বিন শুয়াইব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন: "চিকিৎসাশাস্ত্র রপ্ত না করে কেউ যদি চিকিৎসা করে কারো ক্ষতি করে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে"।[২০] ইমাম ইবনুল

---

১৫. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিব, অনুচ্ছেদ : ফি আর রজুলি ইয়াতাদাওয়া, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১৫০৭, হাদীস নং- ৩৮৫৫

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ ».

১৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আত-তিব, অনুচ্ছেদ : মা আনযালাল্লাহু দাআন ইল্লা আনযালা লাহু শিফাআন, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ৪৮৬, হাদীস নং-৫৬৭৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

১৭. ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, বৈরুত : মুয়াচ্ছাছাত আল-রিসালাহ, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ১০৭

১৮. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আল-যুরকানী, *শরহে যুরকানী আলা মুয়াত্তা আল-ইমাম মালিক*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

১৯. ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৮

২০. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : ফী মান তাতাইয়্যাবা ওয়া লাম ইউলাম মিনহু তিববুন ফাআনাতা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫৮৮

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

www.pathagar.com

কাইয়্যিম চিকিৎসকের জন্য আবশ্যকীয় বিশটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আইনের ময়দানে ইসলামী আইনের অগ্রগামিতা এবং সার্বজনীনতার প্রমাণ দেয়।[২১]

এর পাশাপাশি এ কথাও জেনে নেয়া দরকার যে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে একে অপরের সতর তথা শরীয়ত নির্ধারিত গোপন স্থান দেখা নিষেধ। পুরুষের সতর হচ্ছে হাঁটু ও নাভীর মধ্যবর্তী স্থান এবং মহিলার চেহারা ও হাতের তালু ব্যতীত পুরো শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে: "হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। ইহা তাদের জন্য পবিত্র ও কল্যাণকর কাজ। নিশ্চয় তাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন। এমনিভাবে মুমিন নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সাজসজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া.." ।[২২] উক্ত আয়াত পুরুষ ও মহিলা উভয়কে শরীয়ত নিষিদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে দৃষ্টি অবনত করার নির্দেশ দিচ্ছে। দৃষ্টি দেয়ার ক্ষেত্রে যদি এ হুকুম হয় তাহলে এগুলো স্পর্শ করা অবশ্যই হারাম হবে। আর এ ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে মুসলিম ফকীহদের সর্বসম্মত অভিমত।[২৩]

তবে মুসলিম ফকীহগণ অপরিচিত নারীর দিকে পুরুষের দৃষ্টি প্রদান এবং কামনা-বাসনা ব্যতীত স্পর্শ করাকে বৈধ বলেছেন, যদি তা ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোন লেনদেনের জন্য হয় অথবা যদি চিকিৎসার জন্য হয় এবং এমতাবস্থায় কোন মহিলা ডাক্তার না থাকে, অথবা মহিলা ডাক্তার থাকা অবস্থায় পুরুষ ডাক্তার যদি ভাল ও অভিজ্ঞ হয়। এর বিপরীত ক্ষেত্রেও একই বিধান, যদি কোন পুরুষ ডাক্তার না থাকে বা মহিলা ডাক্তার পুরুষের চেয়ে ভাল ও অভিজ্ঞ হয় তাহলে মহিলা পুরুষের চিকিৎসা করতে পারবে এবং প্রয়োজনে তার দিকে দৃষ্টি প্রদান ও তাকে স্পর্শ করতে পারবে

---

২১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৯

২২. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

২৩. আলী ইবনে আবী বকর আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া শরহে বিদায়াত আল-মুবতাদী*, আল-কাহেরা : দারুস-সালাম, ২০০০, খ. ৪, পৃ.৬২; মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৩; আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৫৯

www.pathagar.com

যদিও তা সতর তথা শরীয়ত নির্ধারিত গোপন স্থান হয়। প্রয়োজনের নিরিখেই এ বিশেষ হুকুম, আর প্রয়োজন যে পরিমাণ বিশেষ হুকুমও সে মোতাবেক হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রাবেতা আলমে ইসলামীর ফিক্‌হ একাডেমী প্রদত্ত সাধারণ বিধি হচ্ছে: [২৪]

* শরীয়ত সম্মত কোন উদ্দেশ্য, যেখানে লজ্জাস্থান প্রকাশ করার অনুমতি আছে, মুসলিম মহিলার জন্য তা ব্যতীত অন্য কোথাও লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা বৈধ নয়।
* চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা জরুরী প্রয়োজন হিসেবে ইসলামী আইনে স্বীকৃত। তাই জরুরী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য মুসলিম মহিলার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করার অনুমতি রয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
* তবে এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মুসলিম মহিলা ডাক্তারের সন্ধান করতে হবে। তা না হলে অমুসলিম মহিলা ডাক্তার, তাও না হলে মুসলিম বিশ্বস্ত ও দীনদার পুরুষ ডাক্তার, সর্বশেষ অমুসলিম পুরুষ ডাক্তার, এ ধারাবাহিকতায় সন্ধান করতে হবে।
* উল্লেখ্য যে, পুরুষ ডাক্তারের ক্ষেত্রে মহিলা রোগীর সাথে তার স্বামী, কোন স্বজন যার সাথে বিবাহ হারাম কিংবা অন্য কোন মহিলা অবশ্যই থাকতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন রোগব্যাধি চিকিৎসা করাকে বৈধতা দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে। শুধু উৎসাহ নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা করা আবশ্যিক করেছে যদি এর উপর মানুষের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করে। আর ডাক্তার হচ্ছে চিকিৎসার একটি উপায়। ডাক্তারইতো রোগ সনাক্ত করবে এবং তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপত্র দিবে। এ জন্য ইসলামী আইন তাকে প্রয়োজনীয় অধিকার প্রদান করেছে যাতে সে নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাকার্য করতে পারে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োজনে অন্যের গোপনীয় স্থান দেখাকে তার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। মানবদেহে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করার ক্ষেত্রে তার জন্য অনুমতি রয়েছে যা ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন না হওয়া দাম্পত্য জীবনে একটি রোগ যার জন্য চিকিৎসা করা, ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া, ডাক্তারকে যাবতীয় বিষয়াদি অবহিত করা, ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র নেয়া ইত্যাদি আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন না হওয়ার চিকিৎসা কখনো ঔষধের মাধ্যমে করা সম্ভব। আবার কখনো তা সম্ভব হয় না, ফলশ্রুতিতে কৃত্রিমভাবে গর্ভোৎপাদনের আশ্রয় নিতে হয়।[২৫]

---

[২৪]. *কারারাত আল-মাজমা' আল-ফিকহী*, আদ-দাওরাহ আস-সাবিয়াহ, ১৯৮৪, *মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী*, পৃ. ৩৩৫

[২৫]. ড. আতা আবদুল আতী সিনবাতী, *কাযায়া মুয়াসিরাহ; আল-ইখসাব আত-তিব্বী আল-মুসায়িদ*, জামেয়া' আল-আজহারঃ কুল্লিয়্যাহ আশ-শারীআহ ওয়াল কানুন, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ১৭০

www.pathagar.com

১. কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের কারণসমূহ

বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের ভাষ্য অনুযায়ী স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন ব্যর্থ হওয়ার পেছনে কতিপয় কারণ রয়েছে[২৬] যা সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে।

এক : যেসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত সাধারণ চিকিৎসা নিয়ে সেরে ওঠা সম্ভব।[২৭] এগুলো হলো :

- যৌন রোগঃ যিনা, ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাসের চর্চা বিভিন্ন যৌনরোগের জন্ম দেয়, যার ফলস্বরূপ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে গর্ভোৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিংবা বিনষ্ট হয়ে যায়।
- গর্ভপাতঃ গর্ভপাত হচ্ছে গর্ভধারণের প্রথম স্তরেই ভ্রূণ বের করে ফেলা। এর ফলে জরায়ু ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাওয়ার ফলে জরায়ুর ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া এর ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। গর্ভপাতের ফলে মহিলার প্রজনন ব্যবস্থায় (Reproductive System) প্রদাহের সৃষ্টি হয় যার পরিণাম অনেক সময় পুনরায় গর্ভধারণ করতে অক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছায়।
- গর্ভধারণ না হওয়ার জন্য IUD তথা Intra-Uterine Device এর ব্যবহারঃ ইহা ব্যবহারের ফলে দেহের বিভিন্ন টিউব, রগসহ জরায়ুতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে অকার্যকারিতা দেখা দেয়।
- ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম করাঃ এর ফলে দেহের বিভিন্ন টিউব বিশেষ করে (Fallopian Tube) (Salpinx) এ প্রদাহের সৃষ্টি করে। এছাড়াও ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম জরায়ুর অভ্যন্তর অংশকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
- মহিলা কর্তৃক কায়িক শ্রম, কঠিন শারীরিক ব্যায়াম এবং খেলাধুলা ও নাচের চর্চাঃ কায়িক পরিশ্রম মহিলার মধ্যে দুশ্চিন্তা, মাসিক ঋতুস্রাবে অনিয়ম এবং বন্ধ্যাত্বের জন্ম দেয়। কঠিন শারীরিক ব্যায়ামের ফলে মহিলার হরমোন বিশেষ করে ডিম্বাণুর জন্য নির্ধারিত হরমোনগুলো হ্রাস পায় যার ফলে গর্ভোৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।
- গর্ভাশয়ের টিউব কেটে ফেলাঃ গর্ভধারণ যখন মায়ের জীবনের উপর ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায় তখন তা করা হয়। অবশ্যই তা পুনরায় জোড়া দেয়া যায় তবে তা ব্যয়বহুল এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতেও এর সফলতা ৩০-৪০% এর বেশী নয়।

---

২৬. যিয়াদ আহমাদ সালামাহ, *আতফালুল আনাবীব বাইনা আল-ইলম ওয়া আশ-শারীআহ*, বৈরুত : আদ্-দারুল আরাবিয়্যাহ লিল উলূম, ১৯৯৬, পৃ. ৩২-৩৮

২৭. ড. মুহাম্মাদ আলী আল-বার, *আখলাকিয়াত আত-তালকীহ আল-ইসতিনায়ী, নাযরাহ ইলাল জুযুর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩৭

www.pathagar.com

এছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে, কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত যার চিকিৎসা সম্ভব। নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদন না হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ। উপরে বর্ণিত কারণ সমূহের ক্ষেত্রে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা, এবং যৌনরোগ, গর্ভপাত ও গর্ভরোধকারী বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন হবে এর মূল চিকিৎসা। ইসলাম তার সুমহান শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে এক সর্বোত্তম চিকিৎসা নীতি দিয়েছে। সকল প্রকার অবৈধ যৌনচর্চা যেমন: যিনা, ব্যভিচার, নারী ও পুরুষের সমকামিতা, Homosexuality, Lesbianism, ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম এবং গর্ভপাত ইত্যাদিকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সকল প্রকার পাপাচারের দ্বার বন্ধ করার জন্যই ইসলাম যথাসময়ে বিবাহ এবং বিবাহকে সহজসাধ্য করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের এ শিক্ষা পালনে কোন প্রকার মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট স্বীকার করতে হয় না, যা এর বিপরীত করলে করতে হয়। এছাড়াও ইসলামের এ শিক্ষা পালনের মধ্যে রয়েছে দৈহিক এবং মানসিক নির্মলতা ও প্রশান্তি যা একজন মানুষকে মানবিক সকল গুণসহ সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে সহযোগিতা করে। এর বিপরীত পথ অবলম্বনে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকসহ সকল প্রকারের কষ্ট স্বীকার করতে হয়।[২৮]

দুই : কতিপয় কারণ যা কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন বা ডাক্তারী সহযোগিতায় প্রজনন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।[২৯] যেমন :

* শুক্রাণুর (Spermatozoid) স্বল্পতা বা দুর্বলতা।
* জরায়ুর অভ্যন্তরভাগ বেরিয়ে পড়া, যার ফলে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলন সম্ভব হয় না।
* শুক্রাণু এবং মহিলার প্রজনন ব্যবস্থার (Reproductive System) মাঝে রোগ বা যে কোন কারণে বাধার সৃষ্টি হওয়া।
* জরায়ুর অভ্যন্তরভাগ মূল স্থান থেকে সরে আসা (Endometeriosis) ।
* টিউব তথা বাচ্চানালী বন্ধ হয়ে যাওয়া।
* অতিরিক্ত মোটা হওয়ার কারণে সঠিক ও সফলভাবে যৌন সঙ্গম করতে সক্ষম না হওয়া।
* স্বামী এমন রোগে আক্রান্ত হওয়া যার ফলে পুরুষত্বহীন (Impotency) হয়ে পড়ে।

এ জাতীয় অবস্থায় কৃত্রিম প্রজনন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গর্ভোৎপাদন সম্ভব নয়। চিকিৎসকের সহযোগিতায় কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন অভ্যন্তরীণভাবে নিষিক্ত করার মাধ্যমে হতে পারে অথবা প্রয়োজনের নিরিখে বাহ্যিকভাবে নিষিক্ত করার মাধ্যমেও হতে পারে, যা টেস্ট টিউব বেবী নামে পরিচিত।

---

[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

www.pathagar.com

২. ইসলামী আইনশাস্ত্রে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন

প্রাচীন মুসলিম ফকীহ ও আইনবিদদের আলোচনায় পাওয়া যায় স্বাভাবিক স্বামী স্ত্রীর সঙ্গম ব্যতিরেকেও কখনো স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যেতে পারে, কারণ সঙ্গম ব্যতীত অন্য যে কোন উপায়েও পুরুষের বীর্য মহিলার যৌনাঙ্গে পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলিম আইনবিদগণ তৎসংক্রান্ত কতিপয় বিধান, যেমন এ পদ্ধতিতে গর্ভধারণ হলে সন্তানের বংশধারা সম্পৃক্ত হবে কি-না, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কতিপয় বিধান এখানে উল্লেখ করা হলো :

প্রথমত : হানাফী মাযহাবের আইনগ্রন্থ "আল-ফাতাওয়া আল-বায্‌যাযিয়া"তে বলা হয়েছে : দাসীর সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে সঙ্গম ব্যতিরেকে যদি মনিব নিজের বীর্য দাসীর যৌনাঙ্গে নিক্ষেপ করে এবং এর দ্বারা সে গর্ভধারণ করে তাহলে দাসী তার সন্তানের মাতা (উম্মে ওয়ালাদ) হয়ে যাবে।[৩০]

দ্বিতীয়ত : "আদ-দুর আল-মুখতার" গ্রন্থে বলা হয়েছে : স্ত্রী তার স্বামীর বীর্য স্বীয় যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে তাকে কি ইদ্দত পালন করতে হবে? হানাফী মাযহাবের আইনী গ্রন্থ "আল-বাহর আল-রায়েক" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : এ ক্ষেত্রেও জরায়ুর গর্ভমুক্তির নিশ্চয়তার জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে। ইবনে আবেদীন এর ব্যাখ্যায় বলেন: এখানে যা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে স্ত্রী যদি স্বাভাবিক সঙ্গম এবং স্বামীর সাথে নির্জনাবাস ব্যতিরেকে অন্য যে কোন উপায়ে স্বামীর বীর্য স্বীয় যৌনাঙ্গে প্রবেশ করায় তাহলে এক্ষেত্রে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি-না।[৩১]

তৃতীয়ত : মালেকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ "হাশিয়া আদ-দাছুকী" তে উল্লেখ রয়েছে যে, যার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে (Apocoptic penis) অথবা নেই তার থেকে যদি বীর্যপাত হয় তাহলে সন্তান তার দিকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং তার বংশধারা সাব্যস্ত হবে।[৩২]

---

৩০. শাইখ নিজামসহ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একটি দল, *আল-ফাতাওয়া আল-বায্‌যাযিয়া*, বৈরুত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ১৯৮৬, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

جاء في (الفتاوى البزازية) في فقه الحنفية: "عالج جاريته فيما دون الفرج فأخذت ماؤه و جعلته في فرجها و علقت منه صارت أم ولد.

৩১. মুহাম্মাদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন, *রাদ্দ আল-মুহতার আলা আদ-দুর আল-মুখতার আল-মারুফ বি হাশিয়া ইবনে আবেদীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭০

جاء في الدر المختار: "أدخلت منيه في فرجها، هل تعتد؟ في البحر بحثا (من كتب الحنفية) نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم. قال ابن عابدين: تعليقا على عبارة: "أدخلت منيه في فرجها" أي أدخلت مني زوجها في فرجها من غير خلوة ولا دخول.

৩২. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আরাফাহ আদ্-দাছুকী, *হাশিয়া আদ-দাছুকী আলা শারহ্ কাবীর*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৪৬০

www.pathagar.com

চতুর্থত : শাফেয়ী মাযহাবের আইনগ্রন্থ "মুগনী আল-মুহতাজ" এ উল্লেখ রয়েছে: সঙ্গমের পর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। এমনিভাবে যদি সঙ্গম ব্যতিরেকে যে কোন উপায়ে বীর্য স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পৌঁছে তাহলেও ইদ্দত পালন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বের করা এবং প্রবেশ করানো উভয় অবস্থায় বীর্য অবশ্যই বৈধ হতে হবে। ইমাম মাওয়ারদী বলেন: ইদ্দত আবশ্যক হওয়ার জন্য বীর্য বের করা এবং প্রবেশ করানো উভয়ই বৈবাহিক সম্পর্কের ছত্রছায়ায় হতে হবে।[৩৩] ইমাম আল-বাইজিরামি বলেন: ইদ্দত পালন করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সঙ্গম এবং সঙ্গম ব্যতিরেকে বৈধ বীর্য প্রবেশ করানো উভয়ের বিধান এক ও অভিন্ন।[৩৪]

পঞ্চমত : হাম্বলী মাযহাবের আইনগ্রন্থ "কাশ্‌শাফ আল-কিনা" তে উল্লেখ রয়েছে: যে কোন উপায়ে যদি স্ত্রী তার স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে থাকে তাহলে সে সন্তান স্বামীর বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যদি অন্য কারো শুক্রাণুর দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে উক্ত সন্তানের বংশধারা সম্পৃক্ত হবে না।[৩৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের বিষয়টি মৌলিকভাবে আবিষ্কৃত নতুন কোন বিষয় নয়; বরং ইহা সুপ্রাচীন এবং ইসলামী আইনে পরিচিত একটি বিষয়। ইসলামী আইনবিদগণ এ সংক্রান্ত কিছু বিধান যেমন ইদ্দত পালন, বংশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইস্যু আলোচনা করেছেন। ইসলামী আইনবিদগণ মানুষের বীর্যের দু'টি পরিচয় দান করেছেন। একটি হচ্ছে বৈধ এবং অপরটি হচ্ছে অবৈধ।

جاء في حاشية الدسوقي في فقه المالكية: "أن المجبوب و الخصي إذا تأتي منهما الإنزال لحق الولد بهما و ثبت نسبه".

৩৩. আবু যাকারিয়া আন-নববী, শারহে শাইখ মুহাম্মাদ শারবিনী আল-খাতীব, *মুগনী আল-মুহতাজ*, তাহকীক: আবদুল্লাহ ইবনে ইব্রাহীম আল-আনসারী, কাতার : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৫৮, খ. ৫, পৃ. ৭৮-৭৯

جاء في مغني المحتاج في فقه الشافعية: وإنما تجب العدة إذا حصلت الفرقة بعد وطء، أو الفرقة بعد استدخال منيه، -أي الزوج- لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج، ولابد أن يكون المني محترما حال الإنزال و حال الإدخال، وفي ذلك حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال و الاستدخال معا في حال الزوجية.

৩৪. আল-বাইজিরামি আলী আল-খাতীব, শাইখ মুহাম্মাদ শারবীনি আল-খাতীব, *হাশিয়া শাইখ সোলাইমান আল-বাইজিরামি আল-মারুফ বিল ইকনা ফি হাল্লি আলফাজ আবি শুজা*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮১, খ. ৪, পৃ. ৩৮

يقول البيجيرمي في حاشيته على الخطيب: في فقه الشافعية: "وكالوطء – في وجوب الاعتداد- استدخال المني المحترم حال خروجه".

৩৫. মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্‌শাফ আল-কিনা*, বৈরুত : দারুল আলম আল-কুতুব, খ. ৫, পৃ. ৪১২

جاء في كشاف القناع في فقه الحنابلة: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه، فإذا كان حراما – أي الماء الذي تحملته- كماء الأجنبي فلا نسب.

www.pathagar.com

বৈধ বীর্য বলতে বুঝানো হয়েছে, যা পুরুষ থেকে বের করা এবং মহিলার যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো উভয়ই বৈধ অবস্থা তথা বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় করা হয়। অবৈধ বীর্য বলতে যা পরপুরুষ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরনারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো হয়, অর্থাৎ উভয়ই অবৈধ অবস্থা তথা বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত অবস্থায় করা হয়। কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী বলতে মূলত যা বুঝানো হয় মুসলিম ফকীহগণ বর্তমান সময়ের অনেক পূর্বেই তার সমাধান দিয়ে রেখেছেন।[৩৬]

৩. শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু ক্রয়-বিক্রয়

বর্তমান কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি পক্ষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যারা মূলত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু সরবরাহ করে থাকে। তাই এ পর্যায়ে এ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি। বিগত কয়েক যুগ ধরেই এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যারা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংরক্ষণ ও সরবরাহ করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান শুক্রাণুর ব্যাংক (Semen Bank) নামে পরিচিত।[৩৭] এ

---

৩৬. সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, *হুকমু আল-ইসলাম ফি আত-তালকীহ আস-সিনায়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৩৭. ফ্রান্সে সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে মিডিয়ার ব্যাপক হৈ চৈ এর মধ্য দিয়ে শুক্রাণুর উপর পড়াশোনা ও গবেষণা শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে এ লক্ষ্যে ফ্রান্সেই দশটি কেন্দ্র খোলা হয়। বর্তমানে ফ্রান্সের মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ বিভিন্ন স্থানে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান জালের মত ছড়িয়ে আছে। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের সর্বপ্রথম শুক্রাণু ব্যাংক বা কোম্পানী জন্ম লাভ করে। ডা. রবার্ট গ্রাহাম এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত ও নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্বদের বীর্য ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে যারা মেধাবী, প্রতিভাবান সন্তান জন্ম দিতে চায় তাদের নিকট এগুলো বিক্রি করা হয়। ব্যাংকের নিকট ক্যাটালগ থাকে যেখানে এ সকল ব্যক্তিত্বদের নাম, তাদের গুণাবলী, যোগ্যতা ও কৃতিত্বের রেকর্ড উল্লেখ থাকে। যে মহিলা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিত্বের বীর্য চায় ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত মূল্য পাঠিয়ে দেয়ার সাথে সাথে ব্যাংক তাকে বীর্য সরবরাহ করে থাকে। ১৯৮৫ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে "সিমেনস ব্যাংক" এর প্রসার ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে জাপানে তা জন্ম লাভ করে। ব্যাংকের নিকট শুক্রকীটের নমুনা বিশেষ টিউবে বিশেষ পরিবেশে সংরক্ষিত থাকে যতক্ষণ না এর দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত করতে আগ্রহী মহিলাদের নিকট তা স্থানান্তর করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জাপানে নব্বই এর দশক পর্যন্ত শুক্রাণু ব্যাংক বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বিনামূল্যে বা ক্রয় করে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংগ্রহ করার মাধ্যমে সেখানকার মহিলারা প্রায় এক মিলিয়ন শিশু এই পদ্ধতিতে জন্ম দিয়েছে। মিসরেও অবশেষে এ ব্যাংক জন্ম নিয়েছে ব্যাপক মতপার্থক্যের মধ্য দিয়ে। যারা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করতে অক্ষম দম্পতিদের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। ঠিক এরই পথ ধরে পরবর্তীতে ডিম্বাণু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করে। অস্ট্রেলিয়াতে সর্বপ্রথম এ জাতীয় ঘটনা ঘটে। এক মহিলা তার ডিম্বাণু সন্তান ধারণ করতে অক্ষম অপর এক মহিলাকে দান করে, পরে টিউবের মাধ্যমে তা নিষিক্ত করার পর ঐ মহিলার জরায়ুতে তা স্থানান্তর করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আইনত ডিম্বাণু ৫০০০ ডলার এবং যুক্তরাজ্যে ২০,০০০ ডলার মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

www.pathagar.com

সকল ব্যাংক স্বামী স্ত্রীর নিজেদের জন্য সঞ্চয় করার নিমিত্তে রাখা শুক্রাণু ব্যতীত অন্যান্যদের থেকে দু'ভাবে বীর্য সংগ্রহ করে থাকে। হয়তবা কারো স্বেচ্ছায় দান করার মাধ্যমে, অথবা কিনে নেয়ার মাধ্যমে। অতঃপর ব্যাংক সংগৃহীত বীর্য দু'ভাবে সংরক্ষণ করে :

এক : ব্যাংক সংগৃহীত বীর্যগুলো কখনো পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে, সাথে সাথে যার বীর্য তার পরিচয়, শারীরিক গঠন, দেহের রং, সামাজিক মান-মর্যাদা, কৃতিত্বাবলী ইত্যাদি যাবতীয় উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি সম্বলিত একটি ক্যাটালগও ব্যাংক সরবরাহ করে। ব্যাংক থেকে এ জাতীয় শুক্রাণু ক্রয় করতে আগ্রহী মহিলারা সহজেই এ ক্যাটালগ থেকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বাছাই করতে পারে। তবে এ জন্য চিকিৎসা খরচ ব্যতীত শুধু এ বাবদ তাদেরকে বিশাল অংকের টাকা গুনতে হয়।

দুই : সংগৃহীত বীর্যগুলো একসাথে ককটেল করে রাখা হয়। এখানে কোন ক্যাটালগ থাকে না, এবং এ অবস্থায় বীর্যের মালিকের নাম পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। এর পর আগ্রহী ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়।[৩৮]

ডা. রবার্ট গ্রাহাম সর্বপ্রথম "সিমেনস ব্যাংক" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মূলত জাহেলী যুগের প্রচলিত "নিকাহে ইসতিবদা" আধুনিকরূপে চালু করেন। এ প্রতিষ্ঠান যেহেতু টাকার বিনিময়ে মেধাবী ও নোবেল বিজয়ীদের বীর্য সংগ্রহ করে এ পদ্ধতিতে গর্ভোৎপাদনে আগ্রহী মহিলাদের সরবরাহ করে থাকে, যা মূলত জাহেলী যুগের প্রচলিত 'নিকাহে ইসতিবদা'র ন্যায়, যার পরিচয় বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশার রা. ভাষায় এভাবে এসেছেঃ জাহেলী যুগে পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের থেকে দূরে রাখত। অতপর যখন স্ত্রী মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হত তাকে যে কোন একজন মেধাবী, প্রতিভাবান, মান-মর্যাদা সম্পন্ন ও বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিত। অতপর স্ত্রী সে মহান ব্যক্তির সাথে সঙ্গম করত। অবশেষে স্ত্রী ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়ার পর স্বামীর ইচ্ছায় তার কাছে ফিরে আসত এবং স্বামী গর্ভধারণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম থেকে বিরত থাকত। মূলত একটি ভাল ও উন্নত জাতের সন্তান লাভের আশায় স্বামী স্বেচ্ছায় এ কাজ করত।

ইউরোপ ও আমেরিকায় কিছু সংখ্যক মহিলারা এ কাজ শুরু করেছিল। পরবর্তীতে ব্যাপক আকারে তা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এটি একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী মুসলিম বিজ্ঞানী ড. আবদুস সালাম বলেনঃ তিনি নোবেল পাওয়ার পর একটি কোম্পানী তার বীর্য ক্রয় করার প্রস্তাব দেয়, স্বভাবতই তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দেখুনঃ ২৭-২৯ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত "গর্ভধারণের আধুনিক প্রযুক্তি" শীর্ষক সেমিনারে পেশকৃত প্রবন্ধাবলী। টেস্ট টিউব বেবী এবং কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন-ড. মুহাম্মাদ আলী আল বার। ক্লোনিং ও প্রজনন-ড. কারম সাইয়্যেদ গুনাইম। কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের আইনগত বিধান-ড. রেজা আবদুল হালিম।

[৩৮]. ড. আতা আবদুল আতী সিনবাতী, *কাযায়া মুয়াসিরাহ; আল-ইখসাব আত-তিব্বী আল-মুসায়িদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮০

www.pathagar.com

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী আইনের অবস্থান জানা অপরিহার্য। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মানব অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর বা হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এমন যে কোনো কাজ করা সম্পূর্ণভাবে আইনের বিপরীত এবং ইসলামী শরীয়তে তা অবৈধ। রক্ত-মাংস ও দেহ-মনের সমষ্টি মানুষ, যে হচ্ছে সৃষ্টিজগতের কেন্দ্রবিন্দু, যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এ পৃথিবী আবাদ করার জন্য, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই যার খেদমতে নিয়োজিত, পৃথিবীর সব কিছুকে যার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়া হয়েছে যাতে সে সহজেই তার মিশনকে বাস্তবায়ন করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে। এ মানুষ যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন, দুনিয়াতে তার খলিফা করেছেন এবং তাকে এক বিশাল আমানতের দায়িত্ব দিয়েছেন। অতঃপর তাকে পরস্পরে অন্যায় অবিচার না করতে, মারামারি ও হত্যাকাণ্ড না চালাতে, একে অপরকে কষ্ট না দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং হুমকি-ধমকির মাধ্যমে মানব সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে নিষেধ করেছেন। এত সব কিছু শুধুমাত্র মানুষের দেহ-মন ও আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের নিমিত্তেই করা হয়েছে।

সৃষ্টিজগতের কাউকেই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এ মানব অস্তিত্বের ক্ষতি ও ধ্বংস করার অনুমতি দেয়া হয়নি, এমনকি নিজেকে ধ্বংস করারও অনুমতি দেয়া হয়নি। কখনো শাস্তিস্বরূপ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করা যায়, আবার কখনো চিকিৎসার জন্য মানুষের উপর অস্ত্রোপচার করা যায়, যাতে তার কর্মক্ষমতা পুনরায় ফিরে আসে। এ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মানবদেহের যে কোন রূপ ক্ষতি সাধন বৈধ নয় যতক্ষণ না সে জীবিত থাকে। এমনকি মৃত মানুষকেও জীবিত মানুষের মত সম্মান করতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে জীবিত অবস্থায় মানুষ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা যায়। এ ভিত্তিতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর বিনিময় রক্ত বিনিময়ের অনুরূপ হুকুম হবে কি-না? এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই বিভিন্ন দেশের আইনানুযায়ী বিভিন্ন হবে।

যে দেশের ভূমিতে 'সিমেনস ব্যাংক' সহ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবাধ চর্চা হয় সে দেশের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই ঐ দেশ থেকে ভিন্নতর হবে যাদের আইন-কানুন মৌলিকভাবে আসমানী ধর্মের, বিশেষ করে ইসলামের মূল্যবোধের আলোকে গৃহীত। যদিও বর্তমান যুগের সকল আইন এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না, কারণ মানুষ স্বয়ং অধিকার অর্জন করবে, সে কিভাবে অপরের অর্জিত বস্তু হতে পারে। অধিকারী সর্বদা অধিকৃত বস্তু থেকে ভিন্নতর হয়। এছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তাই পরিপূর্ণভাবে হোক বা আংশিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে তাকে অপদস্থ করা ইসলামী আইনে বৈধ হবে না। মানব দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আইন শাস্ত্রে মানব দেহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে :[৩৯]

---

৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮২

www.pathagar.com

প্রথম : নবায়নযোগ্য নয় এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ : মানবদেহের অস্তিত্বের জন্য যা অত্যাবশ্যকীয়। যেগুলো ব্যতীত মানব দেহ তার কাজ সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে অপারগ। যেমন : হার্ট, দু'চোখ, কিডনী ইত্যাদি। এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য নয়। এগুলো নিয়ে কোন প্রকার লেনদেন করা বৈধ নয়।

দ্বিতীয় : নবায়নযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ : মানবদেহের অস্তিত্বের জন্য যা অত্যাবশ্যকীয় নয়। এগুলো ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেগুলোর নবায়ন ঘটে থাকে। যেমন : রক্ত, দুধ, বীর্য ইত্যাদি। এগুলোকে মানবদেহের উপাদানও বলা হয়।

তৃতীয় : অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ : যেগুলোকে শরীরের অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে নামকরণ করা হয়। যেগুলোর উপর অস্ত্রোপচার করার পর আবার পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসে। চুল, নখ, টনসিল ইত্যাদি। উপর্যুক্ত প্রকারভেদ বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, মানবদেহের বীর্য চাই তা পুরুষের হোক বা মহিলার হোক দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। মানবদেহস্থ বীর্য যদিও নবায়নযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত তবুও ইসলামী আইনে এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। ইসলামী আইনে ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে চুক্তিকৃত বস্তুটি ইসলামী আইনের মাপকাঠিতে মূল্যমানযোগ্য হতে হবে। তাই দেখা যায়, অমুসলিমদের নিকট মদ মূল্যবান সম্পদ হলেও ইসলামী আইনে তা সম্পদের মধ্যে গণ্য নয়, কারণ ইসলাম মদকে হারাম ঘোষণা করেছে। যে জিনিস খাওয়া হারাম তা বিক্রি করা এবং কাউকে দান করাও হারাম। এমনিভাবে মানব দেহের বীর্যও ইসলামের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য বা দান করা যায় এমন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সম্মানিত ও সৃষ্টির সেরা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন তাই মানুষকে বা মানুষের কোন অংশকে ক্রয়-বিক্রয় বা কোন প্রকার লেনদেন করার মাধ্যমে মানুষের মান-মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা বৈধ নয়। [৪০]

৪. ইসলামী আইনে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের বিধান

চিকিৎসার সাহায্যে গর্ভোৎপাদন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এ কথা সুস্পষ্ট যে এ পদ্ধতিগুলোতে গর্ভোৎপাদন স্বাভাবিক সঙ্গমের মাধ্যমে হয় না। কারণ স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়তবা পুরুষের মধ্যে হতে পারে, হতে পারে পুরুষ স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনে সক্ষম নয়, এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরুষ থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয়। কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে পুরুষের এর চেয়ে বেশী ভূমিকা রাখার প্রয়োজন হয় না। আবার কখনো স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলার মধ্যে সমস্যা থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে মহিলার ডিম্বাণুতে যদি সমস্যা হয় তাহলে তার জন্য গর্ভোৎপাদনে সক্ষম এমন ডিম্বাণু সরবরাহ করা হয়, এবং তার জরায়ু যদি সন্তান

---

[৪০]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৫

www.pathagar.com

ধারণ করতে সক্ষম হয় তাহলে বাহ্যিকভাবে তথা টিউবের মাধ্যমে নিষিক্ত করার পর জরায়ুতে তা স্থানান্তর করা হয়। আর যদি ডিম্বাণুর পাশাপাশি তার জরায়ুতেও সমস্যা হয় তাহলে সম্পূর্ণ বাহ্যিকভাবে প্রজনন করা হয় যা টেস্ট টিউব বেবী নামে পরিচিত।[৪১]

এ থেকে বুঝা গেল, কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা শুধু তার থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে মহিলার ভূমিকা কখনো সরাসরি শারীরিকভাবে হয়ে থাকে যদি অভ্যন্তরীণভাবে নিষিক্ত করা হয় এবং তার জরায়ুতেই তা ধারণ করা হয়। আবার কখনো সরাসরি শারীরিকভাবে মহিলার অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না যখন বাহ্যিকভাবে টিউবের মাধ্যমে নিষিক্ত করার পর টিউবেই অথবা বিকল্প জরায়ুতে তা ধারণ করা হয়। কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের বিষয়ে ইসলামী আইনের অবস্থান ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমরা এ প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক : অভ্যন্তরীণ (জরায়ুর অভ্যন্তরে) কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন। দুই : বাহ্যিক কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন তথা টেস্ট টিউব বেবী।

৫.১ অভ্যন্তরীণ কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন সংক্রান্ত বিধান

অভ্যন্তরীণভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের কতিপয় প্রকার রয়েছে। কখনো তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়ে থাকে। আবার কখনো এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। আবার কখনো তা সম্পূর্ণভাবে দাম্পত্য বন্ধন ছাড়া হয়ে থাকে। প্রতিটি অবস্থার পৃথক পৃথক সমাধান নিয়ে আমাদের নিম্নের আলোচনা :

এক : স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন যদি স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্যা থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থায় তা বৈধ ও শরীয়তসম্মত হবে, যদি কোন মিশ্রণ ব্যতীত সন্দেহাতীতভাবে শুধুমাত্র স্বামীর শুক্রাণু দিয়ে গর্ভোৎপাদন করা হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে শুক্রাণু সংগ্রহ এবং প্রবেশ করানো উভয়ই দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে, তাই এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থায় শুক্রাণু শরীয়তসম্মত এবং এর মাধ্যমে গর্ভোৎপাদন বৈধ। এর মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের বংশ স্বাভাবিক গর্ভের মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের অনুরূপ হবে। এ ক্ষেত্রে সন্তানের বংশ এবং অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গর্ভের সন্তান এবং এ পদ্ধতিতে জন্ম নেয়া সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৪২] আধুনিক মুসলিম

---

[৪১]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০

[৪২]. দেখুন: যাইনুদ্দীন ইবনে ইব্রাহীম ইবনে নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক শরহ্ কানয আদ্-দাকায়েক*, বৈরুত : দারুল ইহইয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী, ২০০২, খ. ৪, পৃ. ১৪০; আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাছানী, *বাদায়ে আস-সানায়ে ফি তারতীব আশ-শারায়ী*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ১৫৩৪; মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আরাফাহ আদ্-দাছুকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০

www.pathagar.com

ফকীহদের বড় একটি গ্রুপ যেমন: সালাম মাদকুর,[৪৩] ইউসূফ আল-কারযাভী,[৪৪] শাইখ মাখলুফ[৪৫] ও মুহাম্মাদ শালতুত[৪৬] প্রমুখ কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের এ পদ্ধতির বৈধতার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[৪৭] তবে মুসলিম ফকীহগণ এক্ষেত্রে কতিপয় শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক করেছেন।[৪৮] যেমন:

* অবশ্যই তা বৈধ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হতে হবে;
* সংশ্লিষ্ট স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে;
* অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনে চূড়ান্তভাবে অক্ষম হতে হবে;
* স্পেশালাইজড ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
* অপারেশনের পুরো কার্যক্রম দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং স্পেশালাইজড ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট সেবায় নিয়োজিত স্পেশালাইজড হেলথ কেয়ারে হতে হবে।

দুই : স্বামী ব্যতীত অন্যের শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন

কখনো স্বামী বন্ধ্যা হয়ে থাকে। ফলে সে স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় অবস্থায় গর্ভোৎপাদনে সক্ষম হয় না এবং এর চিকিৎসা করাও সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সিমেনস ব্যাংক তথা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয় এবং শুক্রাণু সংগ্রহ করে নেয়। এরপর পরপুরুষের এ শুক্রাণুর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করা হয়। পরবর্তীতে স্বামীর বিছানায় এ সন্তানের জন্ম হয়। স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে সন্তান স্বামীর দিকে সম্পৃক্ত হবে না, কারণ এ

ইমাম মালিক ইবনে আনাছ, *আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা*, বৈরুত : দারু সাদির, ২০০৫, খ. ২, পৃ. ৪৪৫; মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ হাত্তাব, *শরহে মুখতাসার আল-খালীল*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ৩, পৃ. ২০৭; মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৮, খ. ৪, পৃ. ৫৩৯; মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ রামলী, *নিহায়াত আল-মুহতাজ*, বৈরুত : দারুল ইহইয়া আত-তুরাছ, ১৯৯২, খ. ৭, পৃ. ১২৭

৪৩. আল-আওয়িছ, *নিজাম আল-উসরাহ ফিল ইসলাম*, পৃ. ৫১-৫২

৪৪. ইউসুফ আবদুল্লাহ আল-কারযাভী, *ফাতাওয়া মুয়াসিরাহ*, আল-মানসুরাহ : দারুল ওয়াফা, ১৯৯২, পৃ. ৪৯-৫০

৪৫. আল-আওয়িছ, *নিজাম আল-উসরাহ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৪৬. শাইখ মুহাম্মাদ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া, দিরাসাত লি মুশকিলাত আল-মুসলিম আল-মুয়াসির ফি হায়াতিহি আল-ইয়াওমিয়্যাহ আল-আম্মাহ*, আল-কাহেরা : দারুশ শুরুক, ২০০৪

৪৭. *কারারাত মাজলিস আল-মাজমা' আল-ফিকহী আল-ইসলামী*, আদ্-দাওরাহ আস-সামিনাহ, মক্কাহ আল-মুকাররামাহ, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৭.

৪৮. আহমাদ মুহাম্মাদ লুৎফী আহমাদ, *আত-তালকীহ আস-সিনায়ী বাইনা আকওয়ালিল আতিব্বা ওয়া আরায়িল ফুকাহা*, ২০০৬, পৃ. ৮৪; মুহাম্মাদ আহমাদ তাহা, *আল-ইনজাব বাইনা আত-তাহরীম ওয়াল মাসরুইয়্যাহ*, আল-ইসকান্দারিয়া : মুনশাআত আল-মাআরিফ, ২০০৩, পৃ. ১০৬; ড. মুহাম্মাদ আল-মুরসী যুহরাহ, *আল-ইনজাব আস-সিনায়ী, আহকামুহু আল-কানুনিয়্যাহ ওয়া হুদুদুহু আশ-শর'য়ীয়্যাহ*, আল-কাহেরা : দার আন-নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ২০০৮, পৃ. ৩৭-৫৩

www.pathagar.com

সন্তান স্বামী থেকে হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। অনুরূপভাবে যার শুক্রাণু তার দিকেও সম্পৃক্ত করা যাবে না, কারণ তার বীর্য বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট না হওয়ার কারণে অবৈধ এবং শরীয়তে ধর্তব্য নয়, তা বের করার অবস্থায় হোক কিংবা প্রবেশ করানোর অবস্থায় হোক।[৪৯] কখনো কখনো স্বামীর সক্ষমতা সত্ত্বেও উন্নত বংশের আশায় ইনজেকশনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে গর্ভোৎপাদন করানো হয়।

এ প্রকারের প্রতিটি পদ্ধতি ইসলামী আইনে অবৈধ, কারণ এর মাধ্যমে মানব বংশের সঠিক সংরক্ষণ হয় না; বরং এর মাধ্যমে মানব বংশ সংমিশ্রিত হয়ে যায়।[৫০] আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, যখন লিআ'নের আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "কোন মহিলা যদি তার কোন সন্তানের বংশ এমন জাতিগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় যে মূলত এ জাতির নয়, তাহলে আল্লাহর নিকট তার জন্য কিছুই নেই, এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। এমনিভাবে কোন পুরুষ যদি তার সন্তানকে দেখার পর বা সন্তান হিসেবে জানার পরও নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে কিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহ তার থেকে দূরে থাকবেন এবং অগ্রজ ও অনুজ সকলের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন"।[৫১] এ হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি, কোন মহিলার জন্য তার স্বামী ব্যতীত অন্যের শুক্রাণু দিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে তার ডিম্বাণু নিষিক্ত করে গর্ভোৎপাদন করা ইসলামী আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। যদি এ রকম ঘটে তাহলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তা যিনা-ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্ত হবে, যেহেতু এর মাধ্যমে বংশধারা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।[৫২]

এ রকম ঘটনা যদি পাওয়া যায় তাহলে অভিভাবককে এ কাজ থেকে বারণ করার জন্য ধমকীস্বরূপ সামাজিক শাস্তি দিতে হবে। বংশধারার সঠিক সংরক্ষণের তাগিদেই এ কাজ করতে হবে যা ইসলামী আইনের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় জন্ম নেয়া সন্তানের বংশ স্বামীর দিকে সম্পৃক্ত হবে না, কারণ এটি স্পষ্ট যে এ সন্তান তার ঔরসজাত নয়। আবার যার শুক্রাণু তার দিকেও সম্পৃক্ত

---

৪৯. মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্‌শাফ আল-কিনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২

৫০. দারুল ইফতা আল-মাসরিয়্যাহ, *আল-ফাতওয়া*, নং ৬৩, মার্চ, ১৯৮০

৫১. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীমি ফি আল ইনতিফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯০, হাদীস নং-২২৬৩, হাদীসটির সনদ যঈফ।
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ».

৫২. ড. ইউসূফ আল-কারযাভী, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, আল-কাহেরা : মাকতাবা ওয়াহাবাহ, ১৯৮০, পৃ. ১৯০

www.pathagar.com

হবে না কারণ তার শুক্রাণু এ ক্ষেত্রে অবৈধ। কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের এ পদ্ধতি ইসলামী আইন এবং সাধারণ আইন উভয় আইনেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইহা সার্বজনীন চারিত্রিক মূলনীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিপন্থি।[৫৩] এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক শরীয়ত ও আইনে দণ্ডণীয় অপরাধী বিবেচিত হবে।[৫৪]

তিন : দাম্পত্য সম্পর্ক বিহীন নর-নারীর কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন

এ পদ্ধতিতে এমন মহিলার গর্ভোৎপাদন করা হয়ে থাকে যে অবিবাহিত, যার কোন স্বামী নেই এবং শুক্রাণু যার থেকে নেয়া হয়েছে সেও তার স্বামী নয়। সিমেনস ব্যাংক এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব লাভ করার পর পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এ পদ্ধতির গর্ভোৎপাদন ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সেক্টরে প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংগ্রহ করে পৃথক পৃথক ক্যাটালগের মাধ্যমে অথবা ককটেল করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে এবং পরবর্তীতে পছন্দ মোতাবেক গ্রাহকদের সরবরাহ করে। এ ধরনের গর্ভোৎপাদন মূলত নতুন কিছু নয়; বরং তা জাহেলী যুগে প্রচলিত নিকাহে 'ইসতিবদা'র অনুরূপ, যা ইসলাম পনেরশ বছর পূর্বে হারাম ঘোষণা করেছে।[৫৫]

---

৫৩. শাইখ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১; ড. মুহাম্মাদ আবদুল ওহ্হাব আল-খাওলী, *আল-মাসয়ুলিয়্যাহ আল-জিনায়িয়্যাহ লিল আতিব্বা আন ইসতিখদাম আল-আসালিব আল-মুসতাহদাছাহ ফি আত-তিব্বি ওয়াল জারাহাহ*, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৪৪

৫৪. ড. উসামা আবদুল্লাহ কায়িদ, *আল-মাসয়ুলিয়্যাহ আল-জিনায়িয়্যাহ লিল আতিব্বা*, মিসর : দারুন নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৭

৫৫. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মান কলা, লা নিকাহা ইল্লা বিওয়ালিয়্যিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩, হাদীস নং-৫১২৭

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ

www.pathagar.com

পদ্ধতিগতভাবে এটি আধুনিকরূপ ধারণ করেছে মাত্র। এ পদ্ধতিতে গর্ভোৎপাদন যদি সরাসরি সঙ্গমের মাধ্যমে হয় তাহলে তা প্রত্যক্ষ যিনা হবে এবং এ জন্য ইসলামী ও সাধারণ উভয় আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তা অভ্যন্তরীণভাবে নিষিক্ত করার মাধ্যমে হয় তাহলে তা পরোক্ষ যিনা হবে,[৫৬] এবং এ জন্য ধমকীস্বরূপ সামাজিকভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এ ছাড়া এ পদ্ধতিতে জন্ম নেয়া সন্তানের বংশধারা কোন পুরুষের প্রতি সম্পৃক্ত হবে না; বরং শুধুমাত্র মায়ের প্রতি সম্পৃক্ত হবে এবং এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকও অপরাধী বিবেচিত হবে।[৫৭]

চার : স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে পরনারীর ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ এবং পরবর্তীতে তা স্ত্রীর জরায়ুতে বপন করা

এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যখন স্ত্রীর দু'টি ডিম্বাণুই সমস্যাগ্রস্ত হয় এবং গর্ভধারণের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে, তবে তার জরায়ু সুস্থ এবং নিষিক্ত কোন ডিম্বাণু বহন করে সন্তান প্রসব করতে সক্ষম। এর বিপরীতে তার স্বামী সুস্থ এবং গর্ভোৎপাদনে সক্ষম। এ অবস্থায় স্বামী থেকে শুক্রাণু নিয়ে কৃত্রিমভাবে তৃতীয় এক মহিলার গর্ভনালীতে প্রবেশ করানো হয় যার দু'টো ডিম্বাণুই সুস্থ। কখনো ডিম্বাণু তৈরী হওয়ার সময়ে সরাসরি সঙ্গমের মাধ্যমে তা প্রবেশ করানো হয়। অতঃপর পঞ্চম দিনে ডাক্তার জরায়ু অপারেশন (Lavage) করার মাধ্যমে এ মহিলার জরায়ু থেকে নিষিক্ত হয়ে যাওয়া ডিম্বাণু বের করে নিয়ে স্ত্রীর জরায়ুতে বপন করে দেয় যা সন্তান ধারণ করত প্রসব করতে সক্ষম।[৫৮] কখনো কখনো এ ক্ষেত্রে স্বামী ব্যতীত পরপুরুষের শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত করা হয় যখন স্বামী গর্ভোৎপাদনে অক্ষম হয়। অজ্ঞাতবশত যে মহিলার ডিম্বাণু নিষিক্ত করা হয় সে এ দম্পতির মাতা, বোন বা যে কোন আত্মীয় স্বজনের মধ্য থেকেও হতে পারে। আবার কখনো এ মহিলা যার ডিম্বাণু নিষিক্ত করা হয়েছে

فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

৫৬. আবুল বারাকাত হাফিজ আন-নাসাফী, *আল-বাহার আর-রায়িক শরহে কানয আদ্-দাকায়িক*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ৪, পৃ. ১৬৯; শামছুদ্দীন আল-সারাখসী, *আল-মাবছুত*, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৯৮৬, খ. ২, পৃ. ১৯৩

৫৭. ড. উসামা আবদুল্লাহ কায়িদ, প্রাগুক্ত, মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্শাফ আল-কিনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২; শাইখ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮১

৫৮. মুহাম্মদ আলী আল-বার, *তিফ্ল আল-উনবুব ও আত্-তালকীহ আস-সিনায়ী*, জিদ্দা : দারুল মানার, তা. বি.

www.pathagar.com

সে অবিবাহিত হতে পারে। এ সকল অবস্থায় অভ্যন্তরীণভাবে এ জাতীয় গর্ভোৎপাদন ইসলামী আইনে অবৈধ এবং হারাম।[৫৯]

প্রথম অবস্থায় : যেখানে শুক্রাণু স্বামী থেকে নেয়া হয় এবং ডিম্বাণু অপরিচিত কোন নারী থেকে নেয়া হয়। এ অবস্থায় বৈধ হবে না কারণ শুক্রাণু এখানে অবৈধ, যেহেতু এক অপরিচিত নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করার উদ্দেশ্যেই তা বের করা হয়েছে। এমনিভাবে এ অবস্থায় জন্ম নেয়া সন্তান এমন দু'জনের শুক্রাণু দ্বারা সৃষ্ট যাদের মাঝে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। যার ফলে এ সন্তান পিতার প্রতি সম্পৃক্ত হবে না, যেহেতু তা যিনার মাধ্যমে সৃষ্ট সন্তান সদৃশ। এ ক্ষেত্রে সন্তান ঐ মহিলার প্রতি সম্পৃক্ত হবে যে তাকে বহন করেছে এবং প্রসব করেছে। ডিম্বাণু যার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতি সম্পৃক্ত হবে না কারণ এ ক্ষেত্রে ডিম্বাণু অবৈধ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত।

দ্বিতীয় অবস্থায় : যেখানে শুক্রাণু পরপুরুষ থেকে এবং ডিম্বাণুও পরনারী থেকে সংগৃহীত। স্ত্রী এ ক্ষেত্রে শুধু সন্তান পেটে বহন করে প্রসব করেছে। প্রথম অবস্থার ন্যায় এ অবস্থাও অবৈধ, কারণ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উভয়ই অবৈধ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত। অন্যান্য সকল অবস্থায়ও একই বিধান হবে। এ সকল অবস্থায় ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট শুক্রাণু-ডিম্বাণু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উভয়ই আইনের আওতায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। পরিশেষে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যেতে পারে, দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় তথা স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় অভ্যন্তরীণভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন বৈধ হবে না।[৬০]

৫.২ বাহ্যিকভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন (টেস্ট টিউব বেবী) সংক্রান্ত বিধান[৬১]

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গর্ভোৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ গর্ভোৎপাদনে মহিলার গর্ভনালীতেই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্ত করা হয়, কিন্তু বাহ্যিক গর্ভোৎপাদন তথা টেস্ট টিউব বেবীর ক্ষেত্রে তা বাহিরে ল্যাবে করা হয় এবং

---

৫৯. দেখুন: ড. আমির কাসিম আল-কিছী, *মুশকিলাত আল-মাসয়ুলিয়্যাহ আত-তিব্বীয়াহ আল-মুতারাত্তাবাহ আলা আত-তালকীহ আস-সিনায়ী*, আম্মান : দারুল ইলমিয়্যাহ্ ওয়া দারুস সাকাফাহ, ২০০১, পৃ. ৪৩

৬০. মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্শাফ আল-কিনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২; শাইখ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৬১. খৃষ্টীয় ১৯৭৮ সালে লন্ডনে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবীর সফল পরীক্ষা চালানো হয় এবং এর মাধ্যমে "লুইসা ব্রাউন" নামে এক শিশু জন্ম গ্রহণ করে। ডা. পেট্রিক এবং ডা. বব এডওয়ার্ডস এ পরীক্ষা সম্পাদন করেন। এ পদ্ধতিতে জরায়ুর বাহিরে ইনকিউবেটরে ডিম্বাণু নিষিক্ত করানোর পর মায়ের জরায়ুতে তা বপন করা হয়। ইতিবাচক দিক হচ্ছে এখানে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জন্ম নেয়া শিশুর প্রকৃত পিতা-মাতা থেকে সংগৃহীত ছিল। ইসলামী আইনে প্রয়োজন সাপেক্ষে ইহা বৈধ। দেখুন: ড. জাকি হামিদ, *ইসতিনসাখ : ইনফিজার বায়োলোজী*, পৃ. ৩১, ড. আতা আবদুল আতী সিনবাতী, *কাযায়া মুয়াসিরাহ; আল-ইখসাব আত-তিব্বী আল-মুসায়িদ*, প্রাগুক্ত, থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে যে কোন মহিলার জরায়ুতে বপন করা হয়।[৬২] উভয় অবস্থায় মহিলার জরায়ুর প্রয়োজন হয়। জরায়ু ব্যতীত গর্ভের পরিপূর্ণতা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না। জরায়ুতে নির্ধারিত একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই সন্তান দুনিয়ার মুখ দেখে থাকে। বাহ্যিকভাবে গর্ভোৎপাদনের মৌলিক কারণ হচ্ছে মহিলাদের "Fallopian Tube" এ সমস্যা দেখা দেয় যার ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় না। ডাক্তারী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রায় ৯০% মহিলার "Fallopian Tube" এ সমস্যাই বন্ধ্যাত্বের জন্ম দিয়েছে।[৬৩] যেহেতু "Fallopian Tube" হচ্ছে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনস্থল, তাই তা বন্ধ হয়ে গেলে এ মিলন ঘটে না, যার ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না। এমনিভাবে কখনো বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু শুক্রাণু-ডিম্বাণুকে নিষিক্ত হওয়ার পর গর্ভাশয়ে আসার আগে ধ্বংস করে দেয়। আবার কখনো বীর্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে শুক্রকীট না থাকার কারণে অভ্যন্তরীণভাবে নিষিক্ত করানো সম্ভব হয় না যা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও ধরা পড়ে না। এ সকল প্রেক্ষিতে ডাক্তার বাহ্যিকভাবে গর্ভোৎপাদনের আশ্রয় নেয়,[৬৪] প্রচলিত ভাষায় যা "টেস্ট টিউব বেবী" নামে সর্বাধিক পরিচিত।[৬৫]

বাহ্যিক গর্ভোৎপাদন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ও অভ্যন্তরীণ কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনে সৃষ্ট সমস্যাবলীর কারণসমূহের উপর ভিত্তি করে এর পদ্ধতির ভিন্নতা

---

৬২. মুহাম্মাদ আবদুল বার ও জুহাইর আহমাদ আস-সিবায়ী, *আত-তাবীব আদাবুহু ও ফিকহুহু,* দামেস্ক : দারুল কালাম, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩৭.

৬৩. দেখুনঃ ড. উসামা আবদুল্লাহ্ কায়েদ, প্রাগুক্ত

৬৪. আহমাদ মুহাম্মাদ লুৎফী আহমাদ, *আত-তালকীহ আস-সিনায়ী বাইনা আকওয়ালিল আতিব্বা ওয়া আরায়িল ফুকাহা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; মুহাম্মাদ আহমাদ তাহা, *আল-ইনজাব বাইনা আত-তাহরীম ওয়াল মাসরুইয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৬৫. উল্লেখ্য যে, বাহ্যিকভাবে গর্ভোৎপাদনের ক্ষেত্রে একাধিক জমজ সন্তান জন্ম নেয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে গর্ভধারিণী মা এবং ভ্রূণের মৃত্যুর হার অত্যধিক। একাধিক জমজ হওয়ার কারণে সন্তান সম্পূর্ণ গঠন নিয়ে জন্ম লাভ করতে পারে না, তাই পরবর্তীতে আবার ইনকিউবেটরের আশ্রয় নিতে হয় যার জন্য পিতা-মাতাকে অনেক টাকা গুনতে হয়। ১৯৮৭ সালে লন্ডনে বাহ্যিক গর্ভোৎপাদনের ফলে এক মহিলা ছয়টি জমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে যাদের সবাই জন্মের পরপরই মৃত্যুবরণ করেছে। অপর একজন মহিলা পাঁচটি যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে যার প্রথমটির জন্মের কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু ঘটে, দ্বিতীয়জন জন্মের পর কম্পনের শিকার হয়েছে, তৃতীয়জন অন্ধত্ব এবং পেট ব্যাথা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, চতুর্থজন প্রস্রাবের রাস্তায় সমস্যা নিয়ে এবং পঞ্চমজন ফুসফুসে ব্যাথা নিয়ে জন্ম লাভ করেছে। এছাড়াও বাহ্যিক গর্ভোৎপাদনের ক্ষেত্রে মহিলারা স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে এটা মা ও সন্তান কারো জন্যই নিরাপদ কোন ব্যবস্থা নয়।

www.pathagar.com

ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে কখনো স্বামী থেকে শুক্রাণু, স্ত্রী থেকে ডিম্বাণু এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু স্ত্রীর জরায়ুতেই বপন করা হয়। আবার কখনো এর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরে তৃতীয় এক পক্ষের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, এবং তা শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু অথবা জরায়ু সংগ্রহ করার মাধ্যমে হতে পারে। আবার কখনো শুক্রাণু ও জরায়ু উভয়ই, কখনো ডিম্বাণু ও জরায়ু, কখনো শুক্রাণু, ডিম্বাণু এবং জরায়ু সবগুলোই অপরিচিত তৃতীয় এক পক্ষ থেকে সংগ্রহ করার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে গর্ভোৎপাদন করা হয়। এ সকল পদ্ধতি সামনে রেখে ইসলামী আইনের আলোকে বাহ্যিক গর্ভোৎপাদন তথা টেস্ট টিউব বেবীর বিস্তারিত সমাধান নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা।

এক : স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করা এবং স্ত্রীর জরায়ুতেই তা বপন করা

সাধারণত এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যখন স্ত্রীর জরায়ু এবং দু'টো ডিম্বাণুই সুস্থ থাকে, তবে কোন সমস্যার কারণে স্বাভাবিক বা অভ্যন্তরীণভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যা কখনো "Fallopian Tube" এ, বা "Cervix" তথা জরায়ুর গলদেশে, অথবা "Vagina" তথা যৌননালীতে হতে পারে। আবার কখনো স্বামী কর্তৃক কোন সমস্যার কারণে স্বাভাবিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এটাই হচ্ছে যা টেস্ট টিউব বেবী নামে পরিচিত।[৬৬] ইসলামী আইন বিশারদদের নিকট এ পদ্ধতিতে গর্ভোৎপাদন শরীয়তসম্মত এবং বৈধ। যেহেতু :

* এ পদ্ধতিতে স্বামী থেকে শুক্রাণু নেয়া হয়েছে, যা বের করা এবং প্রবেশ করানো উভয় অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্কের আওতাধীন হওয়ার কারণে বৈধ এবং শরীয়তসম্মতভাবে সন্তান উৎপাদনের উপযুক্ত।
* এমনিভাবে ডিম্বাণু স্ত্রী থেকে সংগৃহীত। তাই তাও বের করা এবং প্রবেশ করানো উভয় অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্কের আওতাধীন হওয়ার কারণে বৈধ এবং শরীয়তসম্মতভাবে সন্তান উৎপাদনের উপযুক্ত।
* এ পদ্ধতিতে বাহ্যিকভাবে নিষিক্ত ডিম্বাণু বপনের জন্য যে জরায়ুর সাহায্য নেয়া হয়েছে তাও স্ত্রীর জরায়ু। তাই শরীয়তসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে এখানে আইনগত কোন আপত্তি নেই।[৬৭]

উপর্যুক্ত অবস্থায় কোন তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এখানে কোন পর্যায়ে স্বামী এবং স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্ব নেই। তাই

---

৬৬. টেস্ট টিউব পদ্ধতিতে কাজ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ যাবতীয় নিরীক্ষা ব্যাপক আকারে সেরে নিতে হবে। ডাক্তারদেরকে অবশ্যই স্ত্রীর শারীরিক সুস্থতা এবং গর্ভোৎপাদনের জন্য তার ডিম্বাণুর উপযুক্ততা এবং সুস্থতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

৬৭. যিয়াদ সালামাহ, *আতফালুল আনাবীব বাইনাল ইলমে ওয়াশ শারীআহ*, আল-উরদুন : আদ-দার আল-আরাবিয়্যাহ লিল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ৯১

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবনে স্বাভাবিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনে সমস্যা হলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে ইসলামী আইনে কোন বাধা নেই।[৬৮] এ পদ্ধতিতে জন্ম নেয়া সন্তান সম্পূর্ণরূপে বৈধ এবং পিতা-মাতা উভয়ের সাথে তার বংশীয় সম্পৃক্ততা হবে, যেহেতু সে বৈবাহিক সম্পর্কের আওতাধীন সংগৃহীত বৈধ শুক্রাণু দিয়ে সৃষ্ট।[৬৯] তাই এ পদ্ধতির বিধান এবং অভ্যন্তরীণ কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের প্রথম পদ্ধতির বিধান (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) এক ও অভিন্ন। তবে মুসলিম ফকীহগণ এক্ষেত্রে কতিপয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন আবশ্যিক করেছেন।[৭০] যেমন :

* গর্ভোৎপাদনের কার্যক্রম শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণুর মাধ্যমে হতে হবে;
* পুরো কার্যক্রমটি বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কের আওতাধীন হতে হবে;
* নিষিক্ত ভ্রূণটি স্ত্রীর জরায়ুতেই বপন করতে হবে যার থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়েছে ;
* চূড়ান্ত প্রয়োজন তথা ইমার্জেন্সী পরিস্থিতি ব্যতীত এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না, যেমন : স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনে চূড়ান্তভাবে অক্ষম হয়ে পড়া ইত্যাদি।
* দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং স্পেশালাইজড ডাক্তার থেকে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, উক্ত কার্যক্রম মা এবং সন্তান তথা ভ্রূণের শারীরিক, মানসিক, স্বাস্থ্যগত ইত্যাদির মারাত্মক কোন ক্ষতি সাধন করবে না। অন্যথায় এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া বৈধ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেন : "নিজের যেমন ক্ষতি করা যাবে না তেমনি অন্যেরও ক্ষতি করা যাবে না"।[৭১]

---

৬৮. দেখুনঃ *কারারাত মাজলিস আল-মাজমা' আল-ফিক্হী আল-ইসলামী*, আদ্-দাওরাহ আস-সাবিয়াহ, মক্কা আল-মুকাররামা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪২-১৪৩, ১৫৬-১৫৭, মাজাল্লাত মাজমা' আল-ফিক্হ আল-ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; যারা এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : শাইখ মুস্তফা আয-যারকা, ড. সালিহ্ আল-ফাওযান, শাইখ আবদুল্লাহ আল-বাস্সাম এবং শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-উছাইমিন, শাইখুল আজহার মুহাম্মাদ শালতুত এবং ড. আবদুল কারীম যায়দান প্রমুখ

৬৯. শাইখ মুহাম্মাদ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া, দিরাসাত লি মুশকিলাত আল-মুসলিম আল-মুয়াসির ফি হায়াতিহি আল-ইয়াওমিয়্যাহ আল-আম্মাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৭০. দেখুনঃ ড. আমির কাসিম আল-কিছী, *মুশকিলাত আল-মাসয়ুলিয়্যাহ আত-তিব্বীয়াহ আল-মুতারাত্তাবাহ আলা আত-তালকীহ আস-সিনায়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; কারারাত আল-মাজমা' আল-ফিকহী, আদ-দাওরাহ আস-সাবিয়াহ, ১৯৮৪, *মাজাল্লাত আল-ফিক্হ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭; ড. মুহাম্মাদ আবদুল ওহ্হাব আল-খাওলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৭১. রাসূলুল্লাহ স. বলেনঃ لا ضرر و لاضرار ইমাম মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুয়াত্তা*, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, অধ্যায় : আল-আকযিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : আল-কাযা ফি আল-মিরফাক, দারুস-সুদানিয়্যাহ লিল কুতুব, ২০০১, পৃ. ৫৩১

www.pathagar.com

* টেস্ট টিউব বেবী নেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দম্পতির পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে।
* হেলথ কেয়ার সেন্টারে ভ্রূণ যাতে একটি অপরটির সাথে সংমিশ্রণ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানব বংশের মৌলিকত্ব সংরক্ষণের জন্য তা অতীব প্রয়োজনীয়।[৭২]
* পুরো কার্যক্রম দক্ষ, অভিজ্ঞ ও স্পেশালাইজড ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে হবে এবং তা স্পেশালাইজড হেলথ কেয়ার সেন্টারের তত্ত্বাবধানে হতে হবে।[৭৩]
* এ সংশ্লিষ্ট একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে যদি কেউ এ নিয়ে অশুভ স্বার্থ আদায় করতে চায় তাকে বা তাদেরকে আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে এক স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করার পর অপর স্ত্রীর জরায়ুতে তা বপন করা যাবে কি-না, এ মর্মে মুসলিম ফকীহদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ এ পদ্ধতিকে বৈধ বলেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে সন্তানের মা কে হবে তা নিয়ে তাদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে।[৭৪] কেউ মত দিয়েছেন, যে সন্তান বহন করেছে অতঃপর প্রসব করেছে সেই মা হবে, যেহেতু কুরআনে বলা হয়েছে "তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে"।[৭৫] অন্যরা মত দিয়েছেন এর বিপরীত, যার ডিম্বাণু সেই সন্তানের মা হবে, কারণ ভ্রূণতো তারই অংশবিশেষ; বহনকারী মহিলার নয়, তদুপরি অপর একটি জরায়ুতে ভ্রূণকে রাখার পর সাধারণত তা খাদ্য-পানীয় দ্বারাই বেড়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে বহনকারী মহিলার রক্ত-মাংসের কোন কিছু থেকে ভ্রূণ উপকৃত হয় না।[৭৬] অপরদিকে মুসলিম ফকীহদের অন্য একটি গ্রুপ এ পদ্ধতিকে অবৈধ এবং ইসলামী আইনে অনুমোদিত নয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

[৭২]. ড. ওমর আল-আশকার এবং স্কলারদের একটি গ্রুপ, *কাদায়া তিব্বিয়াহ মুয়াসিরাহ ফি দাওয়ি আশ-শরীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৯৯০, খ. ১, পৃ. ১৩৫

[৭৩]. প্রাগুক্ত

[৭৪]. বিস্তারিত জানতে দেখুন: আস-সাইয়্যিদ বাস্সাম মুরতাযা, *বুহুছ ও আরা' ফিকহিয়্যাহ হাওলা আল-ইনজাব আস-সিনায়ী ওয়া তিব্ব আল-হায়াত*, বৈরুত : দারুল হাদী, ২০০৬, পৃ. ৪৭-৫২

[৭৫]. আল-কুরআন, ৫৮:২ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

[৭৬]. মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া, আল-ইনজাব আস-সিনায়ী বাইনা আত্-তাহলীল ওয়াত তাহরীম, আল-মানুফিয়্যাহ : কুল্লিয়া আল-হুকুক, *মাজাল্লাত আল-বুহুছ আল-কানুনিয়্যাহ ওয়াল ইকতিসাদিয়্যাহ*, ইস্যু- ১১, ১৯৯৭; সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, হুকমু আল-ইসলাম ফি আত-তালকীহ্ আস-সিনায়ী, *মাজাল্লাত আল-উলুম ওয়াল বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

www.pathagar.com

যেহেতু এর মাধ্যমে ডিম্বাণুধারী মহিলার সাথে ভ্রূণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধুম্রজাল[৭৭] সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে সন্তান ও মা উভয়ই মানসিক ও সামাজিক সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে[৭৮] তাই ইসলামী আইনের প্রকৃতি অনুযায়ী তা বৈধ হতে পারে না। ইসলামী আইনে ক্ষতি করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উভয়টিই নিষিদ্ধ। তাই যার ডিম্বাণু তার জরায়ুতেই তা বপন করতে হবে অন্যথায় বৈধ হবে না। তদুপরি যেহেতু এখানে অন্য এক মহিলার ডিম্বাণু প্রসবকারী মহিলার দেহে পুশ করা হচ্ছে, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যভিচার তথা লেসবিয়্যানিজম এর সাথে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[৭৯] তাই গ্রহণযোগ্য ও অগ্রগণ্য মত হচ্ছে, স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে এক স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করার পর অপর স্ত্রীর জরায়ুতে তা বপন করা যাবে না।[৮০] উল্লেখ্য যে, যেখানে স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে নিষিক্ত করার পর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভাশয়ে তা পুশ করা বৈধ নয় সেখানে বিবাহ বহির্ভূত পরনারীর জরায়ুতে তা পুশ করা সন্দেহাতীতভাবে অবৈধ।[৮১]

দুই : স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে পরনারীর ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ এবং স্ত্রীর জরায়ুতেই তা বপন করা

এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যদি স্ত্রীর দু'টো ডিম্বাণুই না থাকে, অথবা আছে কিন্তু দু'টোই সমস্যাগ্রস্ত হওয়ার কারণে গর্ভোৎপাদনের উপযুক্ত নয়, তবে এ অবস্থায় তার জরায়ু এবং গর্ভনালী সুস্থ ও নিরাপদ। এমনিভাবে স্বামীর প্রজনন ব্যবস্থাও ঠিক আছে, অর্থাৎ তার শুক্রাণু সুস্থ ও গর্ভোৎপাদনের উপযুক্ত। এ ক্ষেত্রে অপর এক নারীর ডিম্বাণুর সহযোগিতা নেয়া হয়ে থাকে এবং স্বামীর শুক্রাণু দিয়ে তার ডিম্বাণুকে বাহ্যিকভাবে নিষিক্ত করে স্ত্রীর জরায়ুতে তা বপন করা হয়। ইসলামী আইনবিদদের নিকট বাহ্যিক গর্ভোৎপাদনের এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ হবে না। যেহেতু :

এ পদ্ধতিতে বের করা এবং প্রবেশ করানো উভয় অবস্থায় স্বামীর শুক্রাণু অবৈধ এবং শরীয়তসম্মতভাবে বৈধ সন্তান জন্ম দেয়ার অনুপযুক্ত। যেহেতু তা বের করা হয়েছে

---

[৭৭]. আল-ইনজাব ফি দাওয়িল ইসলাম, *মাজাল্লাত আল-ইসলাম ওয়াল মুশকিলাত আত-তিব্বীয়্যাহ আল-মুয়াসিরাহ*, আল-কাহেরা : মাতাবে' আল-তুবজী, তা. বি., পৃ. ৪৮৩-৪৯০

[৭৮]. সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, *হুকমু আল-ইসলাম ফি আত-তালকীহ আস-সিনায়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৭৯]. *আল-ইনজাব ফি দাওয়িল ইসলাম*, প্রাগুক্ত

[৮০]. সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৮১]. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

পরনারীর ডিম্বাণুর জন্যই তাই তা অবৈধ। অপরদিকে প্রবেশ করানো অবস্থায় যেহেতু উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই তাই তা অবৈধ। এমতাবস্থায় স্বামীর সাথে এ সন্তানের বংশীয় সম্পর্ক স্থাপিত হবে না।

* বৈবাহিক সম্পর্কের আওতায় না হওয়ার কারণে পরনারীর ডিম্বাণু এখানে অবৈধ, তাই এ নারীর সাথেও বংশীয় সম্পর্ক স্থাপিত হবে না।
* স্বেচ্ছায় স্বামীর শুক্রাণু দিয়ে পরনারীর ডিম্বাণুর নিষিক্ত করা পরোক্ষ ভাবে যিনা-ব্যভিচারের ন্যায় যার জন্য ইসলামী আইনে শাস্তি নির্ধারিত।
* স্বামীর অবৈধ শুক্রাণু দিয়ে পরনারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করার পর তা স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো পরোক্ষভাবে যিনা-ব্যভিচারের ন্যায় যার জন্য ইসলামী আইনে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে।
* ইসলামী আইনবিদদের দৃষ্টিতে শুক্রাণু সংগ্রহ করার সময় যদি অবৈধ তথা বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত হয় তাহলে এ শুক্রাণুর মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের বংশ এর মালিকের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। এ ব্যাপারে সকল আইনজ্ঞ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু শুক্রাণু প্রবেশ করানোর সময় বৈধ হতে হবে কি-না, এ মর্মে ইসলামী আইনবিদদের মাঝে সামান্যতম মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উভয় অবস্থায় শুক্রাণু বৈধ হতে হবে। তাই শুক্রাণু বের করার সময় যদি পরনারীর ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা নিষিদ্ধ ও অবৈধ হবে। কারণ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উভয়ই এক্ষেত্রে অবৈধ, তাই কারো সাথে বংশীয় সম্পর্ক স্থাপিত হবে না; বরং এ ক্ষেত্রে বংশ শুধুমাত্র ঐ মহিলার সাথে সম্পৃক্ত হবে যে তা গর্ভে বহন করে প্রসব করেছে।[৮২]

তিন : দাম্পত্য সম্পর্কহীন পরপুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে পরনারীর ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ এবং পরনারীর জরায়ুতে তা বপন করা

এ পদ্ধতিতে তিন পক্ষই অপরিচিত। এখানে শুক্রাণু, ডিম্বাণু এবং জরায়ুর মালিক সবাই অপরিচিত, কারো মাঝে পরস্পরে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ডিম্বাণু পরনারী থেকে সংগৃহীত ছিল, তাই তা অবৈধ বলা হয়েছে। বর্তমান পদ্ধতিতে যেহেতু সবাই একে অপরের অপরিচিত, কারো সাথে কারো কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, তাই তা অবৈধ।[৮৩] ব্যাপারটি অনেকটা এরূপ যে, স্বামী স্ত্রী

---

৮২. মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্‌শাফ আল-কিনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২; শাইখ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৮৩. মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্‌শাফ আল-কিনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২; শাইখ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১, ড. আমির কাসিম আল-কিছী, *মুশকিলাত আল-মাসয়ুলিয়্যাহ আত-তিব্বীয়াহ আল-মুতারাত্তাবাহ আলা আত-তালকীহ আস-সিনায়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

www.pathagar.com

উভয়ই যদি বন্ধ্যাত্ব রোগে আক্রান্ত হয় তখন কেউ কেউ অপরের সন্তান ক্রয় করে নিজেদের ঔরসজাত বলে চালিয়ে দেয়, যা পালক পুত্র বা অপরের সন্তানকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেয়া নামে পরিচিত। ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে : "আর আল্লাহ্ তোমাদের পালকপুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি"।[৮৪] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : "পালকপুত্রদের তোমরা তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো, এটি আল্লাহর নিকট বেশী ন্যায়সঙ্গত কথা"।[৮৫]

চার : পরপুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ এবং স্ত্রীর জরায়ুতে তা বপন করা

এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেখানে স্ত্রীর দু'টো ডিম্বাণু এবং জরায়ু সুস্থ ও গর্ভোৎপাদনের উপযুক্ত। তবে স্বাভাবিক গর্ভোৎপাদনে ব্যর্থতার কারণ স্বামী থেকে সৃষ্ট। স্বামীর শুক্রাণু হয়ত ডিম্বাণু নিষিক্তকরার জন্য উপযুক্ত নয় অথবা তার বীর্যে শুক্রকীটের সংকট রয়েছে। এমতাবস্থায় এ দম্পতিকে সিমেনস ব্যাংকের আশ্রয় নিয়ে সেখানে থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে বাহ্যিকভাবে স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করে পুনরায় স্ত্রীর সুস্থ জরায়ুতে তা বপন করে নিতে হবে। এ পদ্ধতি অভ্যন্তরীণ কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুরূপ। ইসলামী আইনে এটি অনুমোদিত নয়; নিষিদ্ধ ও অবৈধ।[৮৬]

পাঁচ : স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে পরনারীর ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ অতঃপর তারই (পরনারীর) জরায়ুতে তা বপন করা

এ পদ্ধতির বিধান ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট। ইসলামী আইনে এ পদ্ধতি বৈধ নয়। এখানে ডিম্বাণু এবং জরায়ু যে মহিলা থেকে সংগৃহীত তার সাথে শুক্রাণুর মালিকের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। ইসলামী আইনে তা অবৈধ।[৮৭]

ছয় : পরপুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ এবং পরনারীর জরায়ুতে তা বপন করা

এ পদ্ধতি বাহ্যিক গর্ভোৎপাদনের চতুর্থ পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এখানে স্বামী বন্ধ্যাত্ব রোগে আক্রান্ত এবং স্ত্রীর জরায়ু সমস্যাগ্রস্ত ও সন্তান বহনে অনুপযুক্ত। তাই অপরিচিত একজন পুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে তা পরনারীর জরায়ুতে বপন করা হয়। এ পদ্ধতিও ইসলামী

---

৮৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

৮৫. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

৮৬. মানসূর ইবনে ইউনূস ইবনে ইদরীস, *কাশ্শাফ আল-কিনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১২; শাইখ শালতুত, *আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

৮৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

আইনে অনুমোদিত নয়। এখানে শুক্রাণু পরপুরুষ থেকে সংগৃহীত যার সাথে ডিম্বাণুধারী মহিলার বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। এমনিভাবে যার জরায়ুর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে সেও বৈবাহিক সম্পর্কের আওতাধীন নয়।[৮৮]

সাত : দাম্পত্য সম্পর্কহীন পরপুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে পরনারীর ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ এবং স্ত্রীর জরায়ুতে তা বপন করা

এ পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে গর্ভোৎপাদনের তৃতীয় পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এখানে গর্ভোৎপাদনের পর স্ত্রীর জরায়ুতেই তা বপন করা হবে। ইসলামী আইনে তা অবৈধ। কারণ এখানে অপরের সন্তানকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করা হচ্ছে, যা ইসলামী আইনে অনুমোদিত নয়। এছাড়াও এখানে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুধারী উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই।[৮৯]

আট : তালাকদাতা বা মৃত স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে স্ত্রীর ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ এবং স্ত্রীর জরায়ুতেই তা বপন করাঃ

এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যখন সিমেনস ব্যাংকে স্বামীর শুক্রাণু স্টক থাকে অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মিশ্রিত "Gamete" বা জমাটবদ্ধ ভ্রূণ স্টক থাকে। অতঃপর স্বামীর মৃত্যুর পর বা পরস্পরে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী উল্লেখিত ব্যাংকে রাখা স্টক থেকে স্বামীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে নিজের ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের পর স্বীয় জরায়ুতেই তা বপন করে থাকে। অথবা উল্লেখিত ব্যাংকে রাখা স্টক থেকে উভয়ের মিশ্রিত "Gamete" বা জমাটবদ্ধ ভ্রূণ স্ত্রী নিজের জরায়ুতে বপন করে নেয় এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার পর তাকে প্রসব করে থাকে। এমতাবস্থায় ইসলামী আইনের বিধান হচ্ছে :

* বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য ইদ্দত পালন অবস্থায় বা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সিমেনস ব্যাংকে সংরক্ষিত সাবেক স্বামীর শুক্রাণুর মাধ্যমে গর্ভোৎপাদন করা বৈধ হবে না। কারণ এমতাবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক অবশিষ্ট নেই। এমতাবস্থায় প্রবেশ করানো শুক্রাণু অবৈধ এবং বৈধ সন্তান উৎপাদনের অনুপযুক্ত।[৯০]
* স্বামী স্ত্রীর জীবদ্দশায় বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় থাকা কালে যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত করে সিমেনস ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে স্ত্রী বিধবা বা

---

[৮৮]. প্রাগুক্ত

[৮৯]. সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৯০]. আহমাদ মুহাম্মাদ লুৎফী আহমাদ, *আত-তালকীহ আস-সিনায়ী বাইনা আকওয়ালিল আতিব্বা ওয়া আরায়িল ফুকাহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; মুহাম্মাদ আহমাদ তাহা, *আল-ইনজাব বাইনা আত-তাহরীম ওয়াল মাসরুইয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তার জরায়ুতে তা বপন করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে না। তবে এ পদ্ধতিতে জন্ম নেয়া সন্তান এ দম্পতির সাথে সম্পর্কিত হবে। যেহেতু সন্তান যে "Gamete" বা পরিপূর্ণ কোষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামীর জীবিত অবস্থায় করা হয়েছিল, তাই তা বৈধ এবং শরীয়ত সম্মতভাবে সন্তান উৎপাদনের উপযুক্ত।

* জীবিত অবস্থায় শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যা ব্যাংকে রাখা হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা উঠিয়ে নেয়া উচিত যাতে স্বাভাবিকভাবে সবকিছু এখানেই শেষ হয়ে যায়। তা এ জন্য যে যেহেতু বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে, চাই তা ডিভোর্স, বিচ্ছেদ বা মৃত্যু যে কোন কারণে হোক না কেন, এখন তার স্মৃতি বহন করে কোন লাভ নেই। এমনিভাবে পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় থাকা, মানব বংশের সংরক্ষণ এবং অনাকাঙ্খিত কোন পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার জন্যও এটি অতীব প্রয়োজন। কোন যুবতীর স্বামী মারা যাওয়ার পর যদি ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে সে তার স্বামীর রেখে যাওয়া শুক্রাণুর মাধ্যমে গর্ভ হয়েছে বলে দাবী করে তাহলে কে তাকে এর থেকে হেফাজত করতে পারবে ? তথাপিও স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী এ পদ্ধতিতে সন্তান নিলে বংশীয় সম্পর্ক এবং মীরাসী সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তার জন্য সিমেনস ব্যাংকে সংরক্ষিত স্বামীর শুক্রাণু বা নিষিক্ত ভ্রূণের মাধ্যমে গর্ভোৎপাদন করা বৈধ হবে না।

এ পদ্ধতিতে গর্ভোৎপাদন ইসলামী ও সাধারণ উভয় আইনেই নিষিদ্ধ।[৯১] তা সভ্যতা, ভদ্রতা, চারিত্রিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসহ সার্বিক আইন শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সংশ্লিষ্ট ডাক্তারও এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এ জন্য অনেকেই এ জাতীয় কাজকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির আওতাধীন এনে এর বিপরীত করাকে ফৌজদারী অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করে এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করার জোর দাবী তুলেছেন।[৯২]

---

[৯১]. *কারারাত মাজমা' আল-ফিক্হী আল-ইসলামী*, মাক্কা আল-মুকাররামাহ, ১৯৮৪; মাজমা' আল-বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ, আম্মান, ১৯৮৬; সাদিয়া আল-সাদিক আল-হাসান, হুকমু আল-ইসলাম ফি আত-তালকীহ আস-সিনায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৯২]. ড. উসামা আবদুল্লাহ কায়িদ, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, অভ্যন্তরীণ গর্ভোৎপাদনের মত বাহ্যিকভাবে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনেরও একমাত্র ইসলামী অনুমোদিত পদ্ধতি হল বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রীর মাঝেই তা সম্পাদন করা, অন্যথায় ইসলামী আইনে তা অনুমোদিত হবে না।

উপসংহার

কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন ও টেস্ট টিউব বেবী গ্রহণ যদি বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বৈধ সন্তান লাভের আশায় হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তা বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরে হয় এবং মানব সমাজকে জন্তু-জানোয়ারের সমপর্যায়ে নিয়ে এসে মানব প্রজন্মের তথাকথিত উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে হয় তাহলে তা কখনো বৈধ হবে না; বরং এটি ঘৃণিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রত্যক্ষভাবে ব্যভিচার না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যভিচারের সমতুল্য অপরাধ হবে যার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত শাস্তি। ইসলাম পালকপুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত সংঘটিত কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন পালকপুত্র গ্রহণ করা থেকেও মারাত্মক অপরাধ। পালকপুত্র মূলত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জন্ম নেয়া অপরের বৈধ সন্তান। অপর ব্যক্তি শুধুমাত্র তার সত্যিকার পরিচয় গোপন রেখে তাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অপর দিকে বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরে ঘটিত কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের ক্ষেত্রে অপরের ভ্রূণকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করে নিজেদের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে দু'টো মারাত্মক অপরাধের আশ্রয় নিতে হয়। প্রথমত : এর মাধ্যমে নিজের বংশধারায় অপরের ভ্রূণ প্রবেশ করিয়ে মানব বংশের মৌলিকতা ও ধারাবাহিকতাকে বিনষ্ট করা হয়, যার সংরক্ষণ ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম। দ্বিতীয়ত : এর মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরে জন্ম নেয়া অবৈধ সন্তানকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া হয়। বস্তুত কৃত্রিম হোক আর স্বাভাবিক ভাবে হোক অবৈধ সন্তান জন্মদান থেকে প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই জরুরী নয় মানুষের প্রাকৃতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেও অপরিহার্য। কারণ ইসলামে যা বৈধ তা মানব সভ্যতার জন্যে কল্যাণকর আর যা অবৈধ তা মানব সভ্যতার জন্যে ক্ষতিকর।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৩

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিধিবদ্ধ আইন ও ইসলামী বিধান : একটি পর্যালোচনা

এহ্তেশামুল হক*

[**সারসংক্ষেপ :** *বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় হচ্ছে পরিবেশ। পরিবেশের ওপর বিপর্যয় নেমে এসেছে সারা বিশ্বে। এ নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোয় পরিবেশ বিপর্যয় একটি আতঙ্কের বিষয়। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা যতই বাড়ছে, পরিবেশ বিপর্যয়ের মাত্রা তার চেয়েও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু সংখ্যক মানুষের অবিবেচক আচরণ ও অবহেলার কারণে প্রতিনিয়ত বিষিয়ে ওঠছে পৃথিবীর পরিবেশ। নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। মানুষই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ একটি বড় সমস্যা। উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার লক্ষণ, নদনদীতে লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল নষ্ট হওয়া, বন্দর ও উপকূলীয় দূষণ, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অস্থিরতাসহ সামগ্রিক ভয়াবহ পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন এখন বাংলাদেশ। এসবের মূলে মানুষের কর্মকাণ্ড প্রধানত দায়ী। পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন, অসংগতিপূর্ণ নগরায়ন, জমিতে বেশি মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্প-কারখানায় অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ, আবাসিক এলাকায় শিল্প-কারখানার অবস্থান, যথেচ্ছ বৃক্ষনিধন, অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, যানবাহনের জোরালো হর্ন, উপযুক্ত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ ইত্যাদি পরিবেশকে দূষিত করছে। পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ হুমকির মুখে। ভারসাম্যহীন ও ভয়াবহ এই পরিবেশ দূষণের ফলে ধ্বংস হচ্ছে মাটি, পানি, গাছপালা, বন, কীটপতঙ্গ, প্রাণী ইত্যাদি। ব্যাহত হচ্ছে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন। এ পরিবেশের জন্য সারা বিশ্বই আজ এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। আমরা যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি, তার অবস্থা আরো শোচনীয়। তবে এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে এ পরিবেশ.বিপর্যয় মহামারি আকার ধারণের জন্য বাংলাদেশ যতটা না দায়ী তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশি দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলো। পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি তারাই প্রথম নজর দিয়েছেন ভেবে পশ্চিমা ও তাদের গুণমুগ্ধরা গর্ববোধ করেন। কিন্তু যিনি চিন্তা ও গবেষণার নির্মোহ দৃষ্টিতে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহর প্রতি তাকাবেন, তিনি দেখবেন ইসলামই তার বিধানাবলির মাধ্যমে সর্বপ্রথম পরিবেশ রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে তিবলিস সম্মেলন, রিও ডি জেনেরো সম্মেলন এবং কিয়োটো ও জোহানসবার্গ সামিটসহ একের পর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবে ফলাফল যা ছিল তাই। বস্তুত ইসলাম পরিবেশ রক্ষা করার যে শিক্ষার সূচনা*

* প্রভাষক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

www.pathagar.com

করেছিল এবং তার সীমারেখা নির্ধারণ করেছিল আজ মুসলমানরা সে শিক্ষা ভুলে গিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের নতুন নতুন আইন নিয়ে কথা বলে এবং পড়াশোনা করে। অথচ যে শিক্ষায় নীতি নৈতিকতা নেই সে শিক্ষা অর্জন করে পরিবেশ দূষণ এবং সংরক্ষণ করা আদৌ সম্ভব নয়। যতো সভা, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও আইন প্রণয়ন করা হোক না কেনো তা কোন ফল দেবে না। এই প্রবন্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষায় ইসলামের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনগুলোর সাথে ইসলামী আইনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।]

পরিবেশের সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থ : আরবী 'বীআ' বা পরিবেশের শাব্দিক অর্থ স্থান বা বাসস্থান। আর 'বিআ', 'বাআ' ও 'মাবাআ' শব্দগুলো গোত্রের বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপত্যকা বা পর্বতচূড়ার যেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে আশ্রয় নেয়। এ থেকেই যে পানির স্থানে উটকে বসানো হয় বা যেখানে সে রাত কাটায় তাকে 'মাবাআ' বলা হয়[১]।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ : ইসলামে 'বীআ' বা পরিবেশ বলতে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বোঝায় যা জীবনের সকল পর্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করে। পরিবেশ কখনো আরও ব্যাপকার্থে আমাদের ভারবহনকারী জমিন এবং আমাদের ছায়াদানকারী আসমানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আবার কখনো তা সংকুচিত অর্থে মানুষের ঘরকে এবং তার কাজ ও বাসস্থানকে বুঝায়। এক কথায় পরিবেশ হলো মানুষের চারপাশের সবকিছু। সৃষ্টিজগতের সবকিছু। পানি ও বাতাস এবং প্রাণীজগৎ ও জড়জগতের সব। এটি সে প্রকৃতির আঙ্গিনা যেখানে মানুষ তার জীবন ও নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এসবের মধ্যে মানুষ তাকে একটি সুদৃঢ় পরিবেশে রূপ দিতে পারে। যার পরিমণ্ডলে মানুষ তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাযুক্তিক পরিবেশ গড়ে তোলে। আর পরিবেশের রয়েছে মহান স্রষ্টা এবং মহাপ্রজ্ঞাবান পরিচালক আল্লাহ্ প্রবর্তিত একটি সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহর কাজ, যিনি সব কিছু দৃঢ়ভাবে করেছেন"।[২] কিন্তু মানুষের হাতই পরিবেশের সব সুন্দরকে ম্লান করে। সবুজ ও সজীবতার বিনাশ ঘটায়। ধ্বংসের এই আকৃতিকেই পবিত্র কুরআন বিশৃঙ্খলা হিসেবে এবং অধুনা বিজ্ঞান "দূষণ" নামে অভিহিত করেছে। পরিবেশের শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং পৃথিবীর জীবনকে অসম্ভব ও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে এমন যে কোনো অনাচারের বিরুদ্ধেই ইসলাম সোচ্চার। তা রোধে ইসলাম নানা উপায় ও প্রকৃতির বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করেছে। বরং তার জন্য এমন সব বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে, অন্য যে কোনো সনদ বা ধর্ম কিংবা সংগঠনে যার পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যায় না।

---

[১]. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ১, পৃ. ৫৪৪

[২]. আল-কুরআন, ২৭ : ৮৮ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

www.pathagar.com

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী "পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিবেশ বলে।[৩]"

দূষণের পারিভাষিক অর্থ : মানুষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ অভ্যন্তরে কোনো শক্তি বা দ্রব্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটানো, শেষাবধি যা ক্ষতিকর প্রভাব রাখে এবং মানুষের সুস্থতাকে হুমকির সম্মুখীন করে। যা জীবনীশক্তির উৎসসমূহ কিংবা পরিবেশের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটায়। পরিবেশের সঠিক উপভোগকে করে প্রভাবিত এবং পরিবেশের অন্য বৈধ ব্যবহারগুলোকেও করে বাধাগ্রস্ত। এছাড়াও পরিবেশের কিছু উপাদানকে স্তূপীকৃত করার প্রক্রিয়াকে যা এ পরিবেশ বা তৎসংশ্লিষ্ট নানা জীবন্ত উপাদানকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। যেমন : মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ।

সাধারণভাবে দূষণ বলতে বোঝায় পরিবেশের নান্দনিকতায় বিকৃতি ঘটানো-চাই তা বিশৃঙ্খলা, অপচয়, অপব্যয়, বিনাশ ও কলুষিত বা যা-ই করার মধ্য দিয়েই হোক না কেন। তবে পরিবেশগত ভারসাম্য পরিভাষাটি যাকে অধিকাংশ বাস্তুবিদই মনে করেন এটি একটি আধুনিক পরিভাষা, এর প্রচলন হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই আহবান এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি যা ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী : "যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময় কিংবা যমীনের ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল"।[৪]

পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব : এটি প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব নিজ নিজ ক্ষমতার মধ্যে থেকে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। অতএব যে পরিবেশে অঙ্গীকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয়া হয় না, সেখানে সুস্থ সমাজের সকল উপাদান বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৫]

---

[৩]. ধারা-২ (ঘ), *বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫*

[৪]. আল-কুরআন, ৫ : ৩২

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

[৫]. আল-কুরআন, ৩০ : ৩০

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদে সর্বপ্রথম পরিবেশ রক্ষার্থে ইসলামী দিক নির্দেশনা এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইন বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামী বিধান

আল্লাহপ্রদত্ত দায়বদ্ধতা : আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ উদ্ভূত বিধানাবলিকে কার্যে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত বিনীত বান্দার। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "নিশ্চয় দুনিয়া সুমধুর ও সবুজ (বা সবুজেঘেরা)। আল্লাহ তোমাদেরকে এতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। কারণ তিনি দেখবেন তোমরা কী আমল করো"।[৬] অতএব দুনিয়া ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে জীবন ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যত্ন নেবার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআহ মুসলিমদের এক শিক্ষার ভাণ্ডার। একটি পথ ও পন্থা। আর পরিবেশ সংক্রান্ত যত সনদ, সংগঠন ও আইন হয়েছে, পরিবেশ রক্ষায় যত আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সবই ইসলামী শরীআহর প্রতিফলন ঘটায়। ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে পরিবেশ সংরক্ষণে, পরিবেশের সাথে সুন্দর আচরণে, পরিবেশ রক্ষায় এবং মানুষ ও জীবের কল্যাণে বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনে।

পরিবেশের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা : ইসলামের সৌন্দর্যের আরেকটি দিক হলো, তা মানুষের মধ্যে তার চারপাশের জীব ও জড়জগতের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের আবেগ সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী এবং দুডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি জাতি"।[৭]

রাসূলুল্লাহ স.-এর আদর্শ : রাসূলুল্লাহ স.ও এমন সৃষ্টিজীব ও জগতের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও অকৃত্রিম মমতা প্রকাশ করেছেন। গাযওয়ায়ে তাবূক থেকে মদীনায় ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী হন এবং জাবালে উহুদ যখন তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয় তিনি কী দরদ মাখা ভাষায়ই না তাঁর আবেগ প্রকাশ করেন! তিনি তখন বলেন, "এটি হলো তাবা (অর্থৎ পরিচ্ছন্ন নগরী), এটি হলো উহুদ। এমন পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি"।[৮] শুধু তাই নয় সাহাবায়ে

---

৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আর রিকাক, অনুচ্ছেদ : আকছারু আহলিল জান্নাতি আল-ফুকারা ওয়া আকছারু আহলিন নারি আন-নিসা ওয়া বায়ানিল ফিতনাতি বিন-নিছা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ; রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি, পৃ. ১১৫৩, হাদীস নং-৬৯৪৮
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ».

৭. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم

৮. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং-৪৪২২

www.pathagar.com

কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও দেখিয়েছেন পরিবেশের প্রতি দরদ ও মমতা। যেমন আমরা দেখতে পাই মক্কা এবং এর উপত্যকা, ঝর্ণাধারা, পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষ-লতার প্রতি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভালোবাসা। প্রকৃতির মায়ায় জড়িয়ে তিনি আবৃত্তি করেন, "হায় আমি এমন তৃণভূমিতে রাত কাটাতাম, আমার পাশে থাকত ইযখির ও জলীল ঘাস। আমি যদি কোনোদিন মাজিন্না কূপের কাছে অবতরণ করতাম, আমি কি শামা ও তাফিল কূপ দেখতে পাবো"।[৯]

বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, পরিবেশের ওপর অনাচার এমন একটি ব্যাপক ধারণা যা দূষণ, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং সব ধরনের সীমালঙ্ঘনকে অন্তর্ভুক্ত করে। অনাচারের মধ্যে রয়েছে শুষ্কতা তথা মরুকরণ। ইদানীং যা ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ কর্তৃক ভূমির অনিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজের পরিধি হ্রাস পাচ্ছে। তদুপরি দূষণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আগামী বছরগুলোতে শুষ্ক ভূমি ও মরুকরণ বৃদ্ধি পাবে।

ইসলাম পরিবেশ বা প্রকৃতিতে যে কোনো অনাচারকে হারাম ঘোষণা করেছে। যার মাধ্যমে মানুষ সামগ্রিকভাবে পরিবেশের নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করে তাও নিষিদ্ধ করেছে। চাই তা যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপের মাধ্যমে হোক,[১০] যা মানুষের বসবাসের পৃথিবীর সৌন্দর্যের নিদর্শনগুলোকে বিনষ্ট করে। কারণ পরিবেশের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়া সরাসরি সম্মিলিত মানবতার ভবিষ্যতের জন্য এক ধরনের হুমকি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে কলুষিত করেছে"।[১১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমীনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না"।[১২] আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, "তোমরা আল্লাহর রিযক

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : মানাকিবিল আনছার, অনুচ্ছেদ : মাকদামিন নাবিয়্যি সা. ওয়া আসহাবিহিল মাদীনাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০, হাদীস নং -৩৯২৬

وَيَقُولُ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

১০. রাসায়নিক বোমা যা কিনা আফগান যুদ্ধসহ আরও অনেক যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী ব্যবহার করেছিল।

১১. আল-কুরআন, ৯১ : ০৯-১০ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

১২. আল-কুরআন, ২ : ২০৫

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ

www.pathagar.com

থেকে আহার কর এবং পান কর আর তোমরা ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না"।[১৩] বরং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রবণতার মৌলিক নিয়ম হলো আল্লাহর টেনে দেয়া সীমা অতিক্রম করা, যা ধ্বংস ও বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। বরং তা মানুষের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। যদি না আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে না রাখেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনকারী ও তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীর দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তিদের ন্যায় যারা একটি বড় জাহাজে আরোহণ করেছে। লটারির মাধ্যমে জাহাজের তলা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর কিছু লোক জাহাজের উপর তলায় আর কিছু লোক জাহাজের নিচ তলায় অবস্থান নিয়েছে। নিচ তলার লোকদের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তারা উপরে আসে এবং উপর তলায় অবস্থানকারীদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে। তারা ভাবলো যদি আমরা আমাদের (নিচের) অংশে ছিদ্র করে নেই (যাতে উপরে যাওয়ার পরিবর্তে ছিদ্র থেকেই পানি নেয়া যায়) এবং আমরা উপরের লোকদের কষ্ট না দেই (তবে কতই না উত্তম হয়)। এমতাবস্থায় যদি উপরস্থ লোকেরা নিচের লোকদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং তাদেরকে তাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে নিবৃত না করে (আর তারা ছিদ্র করে ফেলে) তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা তাদের হাত ধরে ফেলে ছিদ্র করতে না দেয় তবে তারা নিজেরাও বাঁচবে এবং অন্য মুসাফিরগণও বেঁচে যাবে"।[১৪]

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন

বাংলাদেশের পরিবেশ আইনের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে এর যাত্রা শুরু। শুরুতেই প্রণীত হয় Environment Pollution Control Ordinance, ১৯৭৭ এবং গঠিত হয় Environment Pollution Control Board. যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। প্রথম জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয় ১৯৯২ সালের জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা। এরপর প্রণীত হয় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫। আইনটি বাস্তবায়নের

---

১৩. আল-কুরআন, ২ : ৬০ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

১৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : আল-কুরআতু ফিল মুশকিলাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩, হাদীস নং-২৬৮৬

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ.

www.pathagar.com

দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর। পরে আইনটি কার্যকর করতে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ও পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ প্রণীত হয়।

এ ছাড়া পরিবেশ সমস্যার মোকাবিলায় বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার, বায়ু ও পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, কঠিন বর্জ্য, বন সংরক্ষণ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, খনিজ সম্পদ, উপকূলীয় বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পয়োনিষ্কাশন বিষয়ক দুই শতাধিক আইন রয়েছে। বাংলাদেশে সার্বিক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের পরিবেশ নীতি ১৫টি খাত চিহ্নিত করেছে। খাতগুলো হলো ১. কৃষি, ২. শিল্প, ৩. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান, ৪. জ্বালানি, ৫. পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ, ৬. ভূমি, ৭. বন, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র, ৮. মৎস্য ও পশুসম্পদ, ৯. খাদ্য, ১০. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, ১১. যোগাযোগ ও পরিবহন, ১২. গৃহ ও নগরায়ণ, ১৩. জনসংখ্যা, ১৪. শিক্ষা ও গণসচেতনতা এবং ১৫. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা। দেশে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতির কিছু উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যগুলো হলো-পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন; দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, সব ধরনের দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, সব ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০০ ও ২০০২ সালে)

এই আইন অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অবসানের প্রয়োজনে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদিপশু, বন্য প্রাণী, মৎস্য ও গাছপালা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এই আইনের ৩ ধারায় সরকার "পরিবেশ অধিদপ্তর" নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করবে, যার প্রধান হবেন একজন মহাপরিচালক। মহাপরিচালককে পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি কোনো শিল্প-কারখানা বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের জন্য জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে মহাপরিচালক তাৎক্ষণিক জরুরি ব্যবস্থা নিতে পারেন।

এ ছাড়া এই আইনের ৬ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, স্বাস্থ্যহানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ করে এমন কোনো যানবাহন চালানো যাবে না। সরকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, মজুদ,

www.pathagar.com

বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে। কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে মনে হলে ৭ ধারা অনুযায়ী মহাপরিচালক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবেন এবং ঐ ব্যক্তি ঐ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারনে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তি ৮ ধারা মোতাবেক প্রতিকারের জন্য আবেদনের মাধ্যমে মহাপরিচালককে অবহিত করবেন। এই ধারার অধীন প্রদত্ত যেকোনো আবেদন নিস্পত্তিকরণকল্পে মহাপরিচালক গণশুনানিসহ যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

এ ছাড়া আইনটির ৯ ধারা অনুসারে কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য নির্ধারিত পরিমাণের বেশি পরিবেশ দূষক নির্গত হলে বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করতে বাধ্য থাকবেন। সৃষ্ট ঘটনা বা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ঐ উল্লিখিত ব্যক্তি মহাপরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করবেন। এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত ব্যক্তির কাছ থেকে মহাপরিচালকের পাওনা হবে এবং তা সরকারি দাবি (Public Demand) হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য ১২ ধারার বিধান মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। এতে বলা আছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের সরকার নিয়োজিত মহাপরিচালকের কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance Certificate) ছাড়া কোনো এলাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। ১২ ধারার এই বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দণ্ড হলো অনধিক তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। এই আইনের ১৫ ধারায় আরো বলা হয়েছে, পরিবেশ আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই শাস্তির পরিমাণ সর্বনিম্ন ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। পলিথিনসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা, মহাপরিচালকের নির্দেশ অমান্যকরণ এবং অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ নির্গমন ইত্যাদি অপরাধের জন্য অনধিক ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করেছে। এতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা, ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন, পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়সম্পর্কিত আবেদনপত্র, নমুনা সংগ্রহের নোটিশ,

www.pathagar.com

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি, দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি, পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ, আপিল, আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি, আপিল শুনানিকালীন পদ্ধতি, পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ, বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি, বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া এই বিধিমালায় প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র এবং ১৪টি তফসিল সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন- পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ, বায়ুর মানমাত্রা, পানির মানমাত্রা, শব্দের মানমাত্রা, মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা, মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা, যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা, ঘ্রাণ মানমাত্রা, পয়োনির্গমন মানমাত্রা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা, শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা, পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০২ এবং ২০১০ সালে)

পরিবেশ দূষণ-সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ প্রণীত হয়েছে। মূলত পরিবেশ দূষণ-সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যই এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই আইনের ৪ ধারা মতে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিটি পরিবেশ আদালতের অবস্থান হবে বিভাগীয় সদরে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে ওই আদালতের বিচারকাজের স্থানগুলো বিভাগীয় সদরের বাইরেও নির্ধারণ করতে পারবে। যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে ওই আদালতের বিচারক নিযুক্ত করা হবে। ওই বিচারক শুধু পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করবেন। ২০০০ সালের পরিবেশ আদালত আইন মোতাবেক ২০০২ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে একটি করে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশি একই বছরে ঢাকায় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি পরিবেশ আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়া সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তরে পরিবেশ আদালত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ২০০৪ সালে সিলেট যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতকে সিলেট বিভাগের পরিবেশ আদালত হিসেবে গঠন করা হয়। এই আইনের ৫ ধারা মোতাবেক অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীনে অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে

www.pathagar.com

পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করতে হবে এবং ওই আদালতে মামলা বিচার ও নিষ্পত্তি হবে। এ ধারায় আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি পরিবেশ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে, তবে এটি হবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং সে জন্য তিনি অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

পরিবেশ আদালত আইনের ৮ ধারায় পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারি আদালত বলে গণ্য হবে। কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত আইনের বিধান সাপেক্ষে দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানাবলিও প্রযোজ্য হবে। ১১ ধারা অনুযায়ী পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, ঐ রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরিবেশ আপিল আদালতে আপিল করতে পারবেন। এই আইনের ১২ ধারায় সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক বা একাধিক পরিবেশ আপিল আদালত স্থাপন করার বিধান রয়েছে। পরিবেশ আপিল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো স্থানে অবস্থিত থাকবে। সরকার ২০০২ সালে ঢাকায় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি পরিবেশ আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরিবেশ আপিল আদালতে আপিল করতে হবে।

কিন্তু এসব আইন থাকা অবস্থায়ও পরিবেশ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইন-সংক্রান্ত অপ্রতুল ও অসমন্বিত চিন্তাচেতনাই টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি কার্যক্রম ও পরিকল্পনা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো জনগণকে জানানোর কোনো মেকানিজম যেমন নেই, তেমন উদ্যোগও নেই। পরিবেশ আইন, নীতি বা বিধিমালায় পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার কোনো বিধান নেই। পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যপরিকল্পনা নেই। পরিবেশ আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকার পেতে চাইলে সর্বপ্রথম তাকে পরিবেশ অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হয়, সরাসরি পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে না। দেশের দুটি বিভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবেশ আদালতের কার্যক্রম থাকলেও রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে এখন পর্যন্ত কোনো পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমগ্র দেশের জন্য একটি মাত্র পরিবেশ আপিল আদালত মোটেও পর্যাপ্ত নয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে অপর্যাপ্তসংখ্যক পরিদর্শক রয়েছেন। ফলে পরিবেশ আদালতের কাজ সুষ্ঠু ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি ব্যাহত হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকার দূষণ এবং শরীয়তের বিধানাবলী

স্বাস্থ্যগত দূষণ : এ সম্বন্ধে কুরআন ও সুন্নাহতে অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। যা স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতন হতে বলে। তারপর সুস্থতা আনয়ন এবং শারীরিক সুস্থতা ধরে রাখার সকল উপায় ও উপকরণ অর্জনের তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং অসুস্থ হলে রোগের ব্যাপারে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সজাগ থাকতে বলেছে। যাতে অন্যদের মাঝে এ রোগ সংক্রমিত না হয়। ইসলাম একইভাবে মানুষের দৈহিক ও স্বাস্থ্যগত সুস্থতা ও তার পবিত্রতা রক্ষায় নানা আদেশ দিয়েছে। যেমন : শরীর, হাত, দাঁত, নখ ও চুলের পবিত্রতা, পোশাক এবং খাদ্য ও পানীয়ের পবিত্রতা, সড়ক, বাড়ি ও নগরের পরিচ্ছন্নতা এবং নদী ও টিউবওয়েল ইত্যাদির পানির বিশুদ্ধতা।

স্বাস্থ্যগত দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা যায় হাসপাতালগুলোতে। রাজধানীতে সরকারি-বেসরকারি, ছোট-বড় মিলিয়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যা এক হাজার ২২৯টি। এর মধ্যে সাতটি বিশেষায়িত, ছয়টি মেডিক্যাল কলেজসহ সরকারি হাসপাতাল ১৭টি। বাকিগুলো বেসরকারি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই পরিসংখ্যানে কোনো চমক নেই। তবে চমকে যাওয়ার মতো তথ্য আছে পরিবেশ অধিদপ্তরে। তাদের পরিসংখ্যান মতে, রাজধানীর এই এক হাজার ২২৯টি চিকিৎসাকেন্দ্রের মধ্যে পরিবেশ ছাড়পত্র আছে মাত্র ২৯টির। অর্থাৎ ৯৭.৫ শতাংশ হাসপাতালেরই পরিবেশ ছাড়পত্র নেই। যে ২৯টির আছে, সেগুলো বেসরকারি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, মিটফোর্ড, শিশু হাসপাতাল, পশু হাসপাতাল, হলিফ্যামিলি হাসপাতাল, শমরিতা হাসপাতালের মতো বড় বড় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল চলছে পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়াই। এমনকি অনেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানেই না পরিবেশ ছাড়পত্রের কথা। আরো বিস্ময়কর হলো, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, তারাও এ সংক্রান্ত আইনের কথা ভালো করে জানে না। আর পরিবেশ ছাড়পত্র না থাকার অর্থ হাসপাতালগুলো যে শুধু পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করছে তা নয়, গুরুতর পরিবেশ দূষণও ঘটাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবেশ ছাড়পত্র না থাকার সুযোগে হাসপাতালগুলোয় সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই। আর হাসপাতালের বর্জ্য পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঢাকা সিটি করপোরেশনের (ডিসিসি) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে জানা গেছে, রাজধানীর হাসপাতাল-ক্লিনিক-রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলো থেকে প্রতিদিন গড়ে ৫০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়।

হাসপাতাল-বর্জ্য ক্ষতিকর, তাই যেখানে-সেখানে ফেলা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। হাসপাতালে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও স্যালাইনের ব্যাগ হেপাটাইটিস-বি ও

www.pathagar.com

হেপাটাইটিস-সি ছড়ায়। এ ছাড়া হাসপাতাল-বর্জ্যের মাধ্যমে ক্যান্সার ছড়ানোর আশঙ্কাও আছে। বর্জ্য থেকে রোগের জীবাণু পানি, বাতাস, পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বলে জানান তাঁরা। ঢাকায় হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'প্রিজম'-এর সমন্বয়ক বলেন, হাসপাতাল বর্জ্য খোলা ডাস্টবিনে ফেললে বাতাসের সাহায্যে জীবাণু সুস্থ মানুষের মধ্যে ছড়ায়। অনেক সময় ড্রেনের পানির সঙ্গে জীবাণু মিশে যায়। সে জীবাণু (WASA)-এর পাইপের ছিদ্র দিয়ে পানিতে মিশে যেতে পারে। পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের মাধ্যমেও জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া ব্যবহৃত সুঁই, সিরিঞ্জ, রক্তের ব্যাগ, বোতল, স্যাম্পল সেল পুড়িয়ে না ফেললে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে তা আবার ব্যবহারের আশঙ্কা থাকে। জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা মোশতাক হোসেন বলেন[১৫], 'হাসপাতাল-বর্জ্যের মধ্যে রোগীদের কাটা-ছেঁড়ায় ব্যবহৃত ছুরি, ব্লেড, সুঁই ও অন্য ধারালো জিনিস থাকে। টোকাইরা তা কুড়ানোর সময় হাত-পা কেটে সংক্রামক রোগ, এমনকি ক্যান্সারেও আক্রান্ত হতে পারে। বর্জ্যের রাসায়নিক উপাদান শরীরের চামড়া, সংবেদনশীল অংশ কিংবা চোখে লাগলে ক্ষতি হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় জন্য প্রয়োজনীয় কোন আইন নেই বললেই চলে।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, একটু খানি অসাবধনতার জন্য অনেক বড় আকারের মহামারি বিস্তার লাভ করতে পারে। একদিকে ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম মহামারির স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বলেছে। অন্যদিকে সমাজের নিরাপত্তার স্বার্থে রোগী নিজ শহরে থেকে আত্মোৎসর্গকারীকে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ, মহামারির সংক্রমণ থেকে মানব সমাজকে সুরক্ষা করা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে বড়। নিশ্চিত করে বলা যায় চিকিৎসা শাস্ত্রের পূর্ণতার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন মুহাম্মাদ মুস্তাফা স.। মা আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় আপন শহরেই অবস্থান করবে এ কথা জেনে যে তার তো কেবল তা-ই হবে আল্লাহ তার জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে সে শহীদের নেকী লাভ করবে"।[১৬]

---

[১৫].http://www.dailykalerkantho.com/print_news.php?pub_no=218&cat_id=1&menu_id=13&news_type_id=1&index=0, Visited on 15 June, 2012

[১৬]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আহাদীছুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪, হাদীস নং -৩৪৭৪
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

www.pathagar.com

উসামা ইবন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "যখন তোমরা কোনো এলাকায় মহামারির কথা শোনো, তখন তোমরা তাতে প্রবেশ করো না। আর তোমার অবস্থান এলাকায় যদি মহামারি দেখা দেয় তবে তা থেকে বের হয়ো না"।[১৭] আর বাস্তবতার ময়দানে চিকিৎসা শাস্ত্রের যিনি প্রথম প্রয়োগ ঘটান তিনি হলেন চতুর্থ খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.।[১৮] এছাড়াও আছে আন্তর্জাতিক স্তরে সাদা বিষ তথা মাদক এবং লাল বিষ তথা এইডস বিস্তারের সমস্যা। বিশ্বে নানা ধরনের মাদক ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক বিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সার্বিকভাবে যার ফলে চুরি, ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকের ফাঁদে পড়ার আগেই তাই পবিত্র কুরআন সতর্ক করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সুকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন"।[১৯]

বায়ু দূষণ

বায়ুদূষণ রোধে আমাদের দেশে নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন আছে, যা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ নামে পরিচিত। সেখানে পরিবেশ ও বায়ুদূষণের সংজ্ঞা দেয়া আছে। এই বিধানে মোটরযান ও শিল্প-কারখানা থেকে কিভাবে বায়ুদূষণ হতে পারে তা স্পষ্ট বলা হয়েছে। বায়ুদূষণের অপরাধে শাস্তির বিধান থাকলেও এর তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

ইবনুল কায়্যিম রহ. তদীয় 'তিব্বে নববী' বা নববী মেডিসিন গ্রন্থে একটি অধ্যায়ই রচনা করেছেন মহামারি ও সেসব রোগ সম্পর্কে বায়ু দূষণের মাধ্যমে যার বিস্তার বা সংক্রমণ ঘটে। আর সেসব সংগ্রহ করেছেন তিনি ওহী (কুরআন ও হাদীসের) বাণী থেকে। পরিবেশ সম্মেলন বসার শতশত বছর আগে তিনি তা রচনা করেছেন। তিনি বলেন, মহামারির সক্রিয় কারণ ও পূর্ণ হেতুগুলোর অন্যতম বায়ু দূষণ। আর বায়ুর উপাদান দূষণ মহামারির প্রকোপকে অনিবার্য করে। এদিকে বায়ু দূষণ হয় খারাপ অবস্থা প্রবল হবার প্রভাবে তার কোনো উপাদান মন্দে রূপান্তরিত হলে-যেমন পচন, দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হওয়া। বছরের যে কোনো সময় ইহা ঘটতে পারে। যদিও প্রায় ক্ষেত্রে এর উদ্ভব ঘটে গ্রীষ্ম ও বসন্তের শেষভাগে।[২০]

---

১৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আত-তিব, অনুচ্ছেদ : মা ইউযকারু ফিত তাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯, হাদীস নং-৫৭২৮

لِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

১৮. http://en.wikipedia.org/wiki/Umar

১৯. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

২০. ইবনুল কায়্যিম, *আত-তিব্ব আন-নাববী*, বৈরুত : দারু মাকতাবা হিলাল, পৃ. ১০৮

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহই তিনি যিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন শরীআহর ইলমসমূহে গভীরতা অর্জনে এবং সেই মৌলিক নীতিমালা ও মূলনীতি উদ্ভাবনে যা তখনো ধ্বংস হবে না যখন দুনিয়ার লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইবন খালদুন পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন অধিক মৃত্যু ও মড়ককে। তিনি আল-মুকাদ্দিমা[২১] নামক অমর গ্রন্থে এর অনেকগুলো কারণ নির্দেশ করেছেন। সেসবের মধ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি। তিনি এতে উল্লেখ করেছেন যে, এর বেশিরভাগের মূলে রয়েছে বায়ু দূষণ। যার কারণ এর বয়োবৃদ্ধি এবং আর্দ্রতা ও বিকৃতি। এ জন্য তিনি বলেন, "মানুষের বিচক্ষণতার অংশ হলো বাড়ি-ঘরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা, যাতে বাতাস তরঙ্গায়িত হতে পারে। যাতে করে বাতাসে বিদ্যমান বিকৃতি ও পচন থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর উপাদানগুলো উড়ে যেতে পারে"।[২২]

সম্প্রতি বিশ্বের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্র করে তুলেছে। গাড়ি-ঘোড়া ও শিল্পকারখানা থেকে সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে আটকে যাচ্ছে। এতে করে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ দূষিত হয়ে পড়ছে। বাতাসে কার্বনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এ পরিবেশে এই দূষণের জন্য মানুষই মূলত দায়ী বলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন। মানুষই এর প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ব্যাহত করেছে। মুসলিমের ঘ্রাণেন্দ্রিয় যেমন নান্দনিক আচরণ ও সুরভিত কাজে অভ্যস্ত তেমনি তা একইসঙ্গে দূষিত পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। চাই যেখানেই দূষণ হোক না কেন। যেমন আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যার সামনে সুগন্ধি উপস্থাপন করা হয় সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ তা বহনে হালকা এবং বাতাসকে সুবাসিত করে"।[২৩]

শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণ দ্বারা উদ্দেশ্য অপ্রিয় শব্দ যা মানুষের কষ্ট বা উদ্বেগের কারণ হয়। আর আওয়াজ বা শব্দ মানুষের অপ্রিয় হবার কারণ তার তীব্রতা ও উচ্চতা। শুনতে অভ্যস্ত এমন স্বাভাবিক ও চির-চেনা আওয়াজ না হলেই মানুষ এমন বোধ করে। এটা কারো অজানা নয় যে চিৎকার ও শোরগোল চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে। মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়। নিশ্চিন্ত, শান্তভাব ও সুচিন্তার নেয়ামতকে ধ্বংস করে। এবং মানুষের সৃজনশীল ও

---

২১. http://en.wikipedia.org/wiki/Muqaddimah

২২. ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা* , ২/৭৭১-৭৭২

২৩. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আলফাযু মিনাল আদাবি ওয়া গাইরিহা, অনুচ্ছেদ : ইসতিমালুল মিসকি ওয়া আন্নাহু আতইয়াবুত তীবি ওয়া কারাহাতি রদ্দির রাইহানি ওয়াত তীবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৭-৭৮, হাদীস নং -৫৮৮৩
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ

www.pathagar.com

উদ্ভাবনী কাজে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব শান্ত অবস্থা ইসলামী সভ্যতার একটি লক্ষণ এবং অন্যতম মূল্যবোধ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নিচু কর; নিশ্চয় সব চাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ"।[২৪]

একইভাবে মানুষের জন্য এমনভাবে গৃহ নির্মাণ জায়েয নয় যা অন্যের বসবাসের জন্য হুমকি হতে পারে। তেমনি টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির অতিমাত্রায় আওয়াজ করাও বৈধ নয়। কারণ তা প্রতিবেশীর শান্তি বিনষ্ট করে কিংবা তাকে ঘাবড়ে দেয়। বরং আরও বিপদ হলো মুসলিম দেশগুলোতেও অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন উৎসবাদি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যেখানে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ অপচয় করা হয় এবং অসুস্থ লোক বরং সাধারণ লোকদের স্বস্তিও কেড়ে নেয়া হয়।

পানি দূষণ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্প্রতি দেশের ৩১২টি নদীর উপর একটি পর্যবেক্ষণ করে। যার মাধ্যমে দেখা যায় নাব্যতা হারানোর কারণে বর্তমানে আমাদের মোট পানি পথের পরিমাণ ৬০০০ কি.মি. এ পৌছেছে যা নিকট অতীতে ২৪০০০ কি.মি. ছিল এবং বর্তমানে বহমান নদীগুলোও পর্যায়ক্রমে উজানে অবস্থিত ভারতের পানি প্রত্যাহার, বাধ নির্মাণের কারণে শীর্ণ নালার মত প্রবাহিত হচ্ছে। আর আমাদের প্রতিবেশীদের এই রকম এক তরফভাবে পানি প্রত্যাহার শুধু ইসলামী আইনের পরিপন্থি নয় আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনও বটে।

সকল ধর্মের পরিসমাপ্তকারী হিসেবে ইসলাম প্রতিটি মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণে তাগিদ দিয়েছে। তাদেরকে পরিবেশে দূষণ ও বিপর্যয় না ঘটাবার আহবান জানিয়েছে। আর এরই অংশ হিসেবে মুসলিম এবং অন্য সবার জন্য পানির প্রবাহে মূত্রত্যাগ বা মলত্যাগ বা ময়লা নিক্ষেপ অথবা মৃত প্রাণী কিংবা কারখানা বা শহরের বর্জ্য নিক্ষেপ হারাম করেছে। যাতে তা দূষিত না হয়, যা মানুষ বা আল্লাহর যে কোনো সৃষ্টিজীবের ক্ষতি সাধন করে। এ কারণেই নবী মুহাম্মাদ স. চলাচলের রাস্তা এবং যে কোনো জলাধারে মলত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ তিনি বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতেও বারণ করেছেন।[২৫] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে মূত্রত্যাগ না করে যা

---

[২৪]. আল-কুরআন, ৩১ : ১৯ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

[২৫]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আত-তহারাহ, অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ি আনিল বাওলি ফিল মায়ির রাকিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৬, হাদীস নং -৬৫৫

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

www.pathagar.com

প্রবাহিত হয় না অতঃপর তাতে গোসল করে"।[২৬] রাসূলুল্লাহ স.-এর বলেন, "তোমরা অভিশাপ ডেকে আনার তিন কাজ থেকে বিরত থাক। চলাচলের রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে অথবা ছায়ায় পেশাব করা থেকে"।[২৭]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে অনেক রোগ দূষিত পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। বিশেষত সেই রোগগুলো যা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া বা প্যারাসাইট থেকে সৃষ্টি হয়। অসুস্থ ব্যক্তির মল বা তার মূত্র থেকে তা সংক্রমিত হয়। এসবের অগ্রভাগে রয়েছে সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েড (Typhoid), হেমাচুরিয়া (Hematuria) (মূত্রের সঙ্গে রক্তপড়া) ও এ্যানছাইলোস্টমা (Ancylostoma) (ফিতাকৃমি টাইপের যা মানুষের রক্ত খেয়ে ফেলে)। আরও নানা ধরনের কৃমি। সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েডের অণুগুলো মানুষের অন্ত্র, রক্ত ও প্রস্রাবে ঠাঁই নেয়। ফলে পানির সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তির পেশাব বা পায়খানার সংযোগ ঘটলে সহজেই তা পানির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর জীবাণু ছড়ানোর আগে অগ্রিম ব্যবস্থা হিসেবেই রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশনা আমাদের সচেতন করে। আমি তো আরও অভিভূত হয়ে যাই পানির বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং মানুষকে রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আগ্রহ লক্ষ্য করে। আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয় তবে সে যেন তার হাত কোনো পাত্রে না ঢুকায়, যাবত না সে তা তিনবার ধৌত করে। কারণ, সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় ছিল"[২৮]। এ বিষয়ে আরও বিস্ময়ের দেখা পাই যখন পানি ও বায়ু দূষণ জনিত রোগ-ব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষায় নিম্নোক্ত বাণীটির কথা চিন্তা করি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমরা পাত্র ঢাক এবং মশকের (মুখ) বন্ধ করো। কারণ, বছরে একটি রাত থাকে যাতে মহামারি নামে। তা এমন কোনো না ঢাকা পাত্র এবং না বাঁধা মশকের সামনে যায় না যাতে সে অবতরণ করে না"।[২৯]

---

২৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং -৬৫৬
عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

২৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তহারাহ, অনুচ্ছেদ: আল-মাওয়াযিউল লাতী নুহিয়া আনিল বাওলি ফী হা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১২২৪, হাদীস নং- ২৬
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

২৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আত-তাহারাহ, অনুচ্ছেদ : কারাহাতু গামছিল মুতাওয়াযযিই ওয়া গাইরিহা ইয়াদাহুল মাশকুকু নাজাসাতিহা ফিল ইনাই কবলা গছলিহা ছালাছান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৫, হাদীস নং -৬৪৩
عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإنَّهُ لا يَدْرِى أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

২৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : ইসতিহবাবি তাখমীরিল ইনা-ই ...., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৮, হাদীস নং -৫২৫৫

www.pathagar.com

অন্যদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপস্থিতি এবং শক্তিমান কর্তৃক টিকে থাকার শ্লোগানকে দস্তুক গ্রহণ মানুষকে নদী, সমুদ্রে ও ভূমিতে বিষাক্ত পদার্থ, শিল্পকারখানার বর্জ্য ও বিষাক্ত মেডিসিন বর্জ্য নিক্ষেপে বাধ্য করছে। পানির উৎসগুলো দূষিত হবার ফলে তা মানুষের ক্ষতি বয়ে আনছে। তবে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুই দুটি পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা ইতিহাসের সব চেয়ে বড় অপরাধটিই করেছে। যার ফলে সামুদ্রিক সম্পদসমূহ দূষিত হয়ে পড়ে। যাকে জাপানের মৌলিক খাদ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। আর আমেরিকা ইরাকের দজলা ও ফোরাতে যা করেছে তাতে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ কত তা কে নিরূপণ করবে?

ভূমি দূষণ

আসমানী সতর্কীকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে জমির উর্বরতা ও তার ফসল দান ক্ষমতা বিনাশকারী প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে সতর্ক করা থেকে। জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধির জন্য মহান এই ধর্ম মানুষকে যেসব কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে তার অন্যতম হলো কৃষি কাজ। যা পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষার মৌলিক উৎস। ইসলাম একে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাগ্রহে কৃষি কাজ ও বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যাতে উদ্ভিদ সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হয়। যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপণ করে অথবা ক্ষেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী খায়, তবে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে"।[৩০] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অনাবাদী) ভূমিকে জীবিত (চাষযোগ্য) করবে, তা তারই জন্য"।[৩১]

পথ-ঘাট ও জনসমাগমস্থলে দূষণ রোধে নির্দেশনা

শরীআহর যে নীতিমালার ভিত্তি স্থাপন করেছেন রাসূলুল্লাহ স. তার একটি হলো ক্ষতি না করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া। তেমনি তিনি পথ থেকে ময়লা, আবর্জনা, ছাল-

---

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

৩০. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আল-মুযারাআহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলিয যারঈ ওয়াল গারছি ইযা উকিলা মিনহু ...., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১, হাদীস নং -২৩২০

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

৩১. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-খারাজ, অনুচ্ছেদ : ফী ইহইয়াহয়িল মাওয়াতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫৫, হাদীস নং -৩০৭৩

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِىَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

www.pathagar.com

বাকল পরিষ্কার করা এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও সওয়াবের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "সাবধান, তোমরা রাস্তায় বসবে না। সাহাবীগণ বললেন, রাস্তায় না বসে তো আমাদের উপায় নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, "তোমাদের যদি একান্তই রাস্তায় বসতে হয় তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের উত্তর দেয়া এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা"।[৩২]

আর কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এমন এক ব্যাপক নির্দেশ রাস্তা ব্যবহারকারী প্রতিটি মানুষের জন্য কষ্টদায়ক সব কিছু যার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ স. আরও বলেন, "ঈমানের তেহাত্তর বা তেষট্টিটি শাখা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা"।[৩৩]

বৃক্ষ নিধন

অপরদিকে অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন রসূলুল্লাহ স.। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি (বিনা প্রয়োজনে) কুল গাছ কাটবে আল্লাহ তার মাথাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন"।[৩৪] তবে যদি গাছটি হয় এমন স্থানে যা মানুষের প্রয়োজনে কাটার প্রয়োজন হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি জান্নাতে সে ওই গাছের (আশ্রয়ে) চলাচল করছে যা সে

---

৩২. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা, "ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানূ লা তাদখুলু বুয়ূতান ....., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫, হাদীস নং -৬২২৯

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

৩৩. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আদাদি শুআবিল ঈমানি...., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭, হাদীস নং -১৫৩

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

৩৪. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী কাতইস সিদরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০৬, হাদীস নং -৫২৩৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِى النَّارِ

www.pathagar.com

রাস্তার মোড় থেকে কেটেছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত"।[৩৫] আবার ফসল ও ফল রক্ষায় তিনি কাজে লাগানোর মতো না হবার আগে ফসল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। যাতে সে ফসল বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রাসূলুল্লাহ স. উপযুক্ত হবার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি বারণ করেছেন।[৩৬] অপর বর্ণনায় রয়েছে আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যাবত না তার ফল প্রকাশিত হয়, মুকুল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যাবত না তার সাদা দানা বের হয় এবং তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা দূর হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি বারণ করেছেন।[৩৭] ইসলাম গবাদিপশুর নাগাল থেকে শস্য ও ফল-ফলাদি রক্ষায় প্রয়োজনীয় শর্তাদিও প্রবর্তন করেছে।[৩৮]

গৃহপালিত পশুকে ক্ষতি থেকে রক্ষা এবং তার প্রতি মমতা

ড. মুস্তাফা আস-সিবাঈ রহ. আমাদের সামনে প্রাণীর প্রতি সহমর্মিতার এক অনন্য দিক তুলে ধরেছেন, মুসলিম ফিকহবিদগণ যা নির্ধারণ করেছেন। তা হলো প্রাণীদের মালিকের ওপর প্রাণীর খরচাদি ওয়াজিব। যদি তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন, তবে তাকে বাধ্য করা হবে। তিনি প্রাণীকে বিক্রি করবেন নয়তো তার ওপর খরচ করবেন অন্যথায় তাকে এমন স্থানে ছেড়ে দেবেন যেখানে প্রাণী তার খাদ্য ও থাকার জায়গা পাবে। তাছাড়া সাধারণভাবে ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে নম্রতার নীতিতে নির্ভর করে। কোমলতাকে মুমিনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বানায়। এমন উপকরণ বানায় যা ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং আমলকে সৌন্দর্য দান করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

---

[৩৫]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইযালাতিল আযা আনিত তরীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৫, হাদীস নং -৬৬৭১

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ

[৩৬]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বাইউস ছিমারি কবলা আইয়াবদুআ ছলাহুহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, হাদীস নং -২১৯৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

[৩৭]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন বাইয়িছ ছিমারি কবলা বুদুয়্যি সলাহিহা বিগাইরি শরতিল কতঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪২, হাদীস নং -৩৮৬৪

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ

[৩৮]. ড. মুস্তাফা আলওয়ানী, আল-ইসলাম ওয়াল বিআ, *মাজাল্লাতুত-তুরাছিল আরাবী*, সংখ্যা : ১০১, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২০০৬

www.pathagar.com

"হে আয়েশা, নিশ্চয় আল্লাহ নরম আচরণকারী, সব জিনিসের মধ্যেই তিনি নরম আচরণ ভালোবাসেন"।[৩৯] আরেক হাদীসে রয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ নরম আচরণকারী, তিনি নরম আচরণকেই ভালোবাসেন এবং নরম আচরণের মাধ্যমে তিনি এত দেন যা তিনি কঠোর আচরণকারীকে কিংবা নরম আচরণকারীকে ছাড়া অন্য কাউকে দেন না"।[৪০]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে জিনিসেই নরম আচরণ থাকুক না কেন, তা তাকে সৌন্দর্য দান করে। আর যা থেকেই তা তুলে নেওয়া হোক না কেন তা তাকে অসম্মানিত করে"।[৪১] প্রাণীকুলের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শন করা যে এক ধরনের ইবাদত সে সম্পর্কে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা কখনো সর্বোচ্চ নেকীতে পৌঁছায় এবং মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রাপ্তির জোরালো কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "একজন কুলটা মহিলা কোনো এক গরমের দিনে একটি কুকুর দেখল একটি কূপের ওপর পিপাসার তাড়নায় তার জিহবাকে বের করে দিয়েছে। সে গিয়ে তার মোজা দিয়ে পানি তুলে তাকে খাওয়াল। অতঃপর এ জন্যই তাকে ক্ষমা করা হয়"।[৪২]

ইসলামী শরীআহ যেভাবে প্রাণীর প্রতি দয়া দেখিয়েছে, প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে, ঠিক সেভাবেই আবার প্রাণীর প্রতি অনাচার এবং তাকে কষ্ট দেওয়াকে গর্হিত পাপ ও কঠিন গুনাহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "এক মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে এই অপরাধে যে সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। আর সে মারা গিয়েছিল। ফলে সে এ

৩৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন, অনুচ্ছেদ : ইযা আরাদায যিম্মিয়ু আও গাইরুহু বিসাববিন নাবিয়্যি ওয়ালাম ইউসাররিহ......, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮, হাদীস নং -৬৯২৭

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

৪০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বির, অনুচ্ছেদ : ফাদলুর রিফকি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩১, হাদীস নং -৬৬০১

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ

৪১. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং -৬৬০২

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

৪২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আস-সালাম, অনুচ্ছেদ : ফাদলু সাকয়িল বাহাইম আল-মুহতারামাহ ওয়া ইতআমিহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭৬, হাদীস নং -৫৮৬০

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِى يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا

www.pathagar.com

কারণে জাহান্নামে যায়। তাকে আটক রেখে না সে দানা পানি দিয়েছে। আর না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে মাটির কীট-মূষিকাদি থেকে খেতে পারে"।[৪৩]

যুদ্ধের সময় পরিবেশ সংরক্ষণের এবং বৃক্ষ নিধন না করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

রাবাহ ইবন রাবীআ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে (তাবূক) আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে ছিলাম। এ যুদ্ধে তিনি তাঁর সাহাবীদের কোনো জিনিসকে কেন্দ্র করে একত্রিত হতে দেখলেন। তিনি একজনকে পাঠালেন এবং বললেন, এরা কিসের ওপর এভাবে একত্রিত হয়েছে। সাহাবী এসে বললেন, একজন নিহত মহিলার সামনে। তিনি বললেন,এ তো হত্যাযোগ্য ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, অগ্রবর্তী দলে ছিলেন খালেদ ইবন ওয়ালীদ রা.। তিনি তাঁর কাছে একজনকে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, "তুমি খালেদকে বলবে সে যেন কোনো নারী বা শ্রমিককে হত্যা না করে"।[৪৪]

এদিকে মুতার যুদ্ধে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ স. তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন- "তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো গৃহও ধ্বংস করবে না"।[৪৫] আবূ বকর রা. একই রীতি অনুসরণ

---

[৪৩]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আহাদিছুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪, হাদীস নং-৩৪৮২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

[৪৪]. ইমাম আল-বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায় : আস-সিয়ার, অনুচ্ছেদ : আল-মারআতু তুকাতিল ফা তুকতালু, হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া : মাজলিসু দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., হাদীস নং-১৮৫৭০

رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَىْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ :« انْظُرْ عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ؟ ». فَجَاءَ فَقَالَ : عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ :« مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ ». قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ :« قُلْ لِخَالِدٍ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيفًا

[৪৫]. ইমাম আল-বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায় : আস-সিয়ার, অনুচ্ছেদ : তারকু কতলি মান লা কিতালা ফীহি মিনার রুহবানি ওয়াল কাবীরি ওয়া গাইরিহিমা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৬২০

عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُشَيِّعًا لأَهْلِ مُؤْتَةَ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَوَقَفَ وَوَقَفُوا حَوْلَهُ فَقَالَ :« اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ بِالشَّامِ وَسَتَجِدُونَ فِيهِمْ رِجَالاً فِى الصَّوَامِعِ مُعْتَزِلِينَ مِنَ النَّاسِ فَلاَ تَعْرِضُوا لَهُمْ وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ لِلشَّيْطَانِ فِى رُءُوسِهِمْ مَفَاحِصُ فَافْلُقُوهَا بِالسُّيُوفِ وَلاَ تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلاَ صَغِيرًا ضَرَعًا وَلاَ كَبِيرًا فَانِيًا وَلاَ تَقْطَعُنَّ شَجَرَةً وَلاَ تَعْقِرُنَّ نَخْلاً وَلاَ تَهْدِمُوا بَيْتًا ».

www.pathagar.com

করেন। তাঁর খিলাফতকালের প্রথম যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণকালে তিনি এর সেনাপতি উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বলেন, "হে লোক সকল, দাঁড়াও আমি তোমাদের দশটি বিষয়ে উপদেশ দেব। আমার পক্ষ থেকে কথাগুলো তোমরা মনে রাখবে। কোনো খেয়ানত করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, (শত্রুদের) বিকৃত করবে না, ছোট বাচ্চাকে হত্যা করবে না, বয়োবৃদ্ধকেও না আর নারীকেও না। খেজুর গাছ কাটবে না কিংবা তা জ্বালিয়েও দেবে না। কোনো ফলবতী গাছ কাটবে না। আহারের প্রয়োজন ছাড়া কোনো ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না। আর তোমরা এমন কিছু লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে যারা গির্জাগুলোয় নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। তোমরাও তাদেরকে তাদের এবং তারা যা ছেড়েছে নিজেদের জন্য তাতে উৎসর্গ করে দেবে"।[৪৬]

এই অমূল্য উপদেশগুলোকে ইসলামের জিহাদের আদবের ক্ষেত্রে সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হয়। এর সবগুলোই পরিবেশ সংরক্ষণের বিধানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি অসুবিধাজনক অবস্থাতেও। কোন অমুসলিম শক্তি কি মুসলিমের দেশ জবর দখলে, তাদের সম্মান হরণে এ ধরনের নীতি ও আদর্শ উপস্থাপন করতে পারবে? তারা কি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করে না? নুয়ে পড়া বৃদ্ধের জীবন হরণ করে না?

আর যুদ্ধক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ স. যেখানে পরিবেশ ও এর উপাদানসমূহ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তাহলে তো স্বাভাবিক অবস্থায় এসব রক্ষায় তাঁর উদ্বুদ্ধকরণের কথা বলাই বাহুল্য। কুরআনুল কারীম কোনো ভেষজপ্রস্তুত বিদ্যা বা চিকিৎসা শাস্ত্র বা কোনো প্রকৌশল বিদ্যা বা বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। তথাপি ইসলাম এসেছে দীন ও দুনিয়া তথা ইহ ও পরকাল উভয়ের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন, "আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই"।[৪৭] ভূপৃষ্ঠে একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে এর অবতরণ। যে সমাজটি পরিবেশ, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক এমনকি স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও হবে পূর্ণাঙ্গ।

মরুকরণে বিরোধিতা এবং বনায়নে উদ্বুদ্ধকরণ

উপরে আমরা যে হাদীসগুলো উল্লেখ করলাম এগুলো ছাড়াও পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং অনেক হাদীস বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে আর ফলদার হওয়া পর্যন্ত তার দেখাশোনা ও সংরক্ষণে ধৈর্য ধারণ করে, তার প্রতিটি ফল যা আহরিত হয় তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সদাকার নেকী লিখে দেন"।[৪৮]

---

[৪৬]. ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭, খ. ২, পৃ. ২৪৬

[৪৭]. আল-কুরআন, ২৭ : ৭৫ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

[৪৮]. ইমাম আল-বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান,* অনুচ্ছেদ : ফিল ইতিযারি ইযা সুয়িলা ওয়ালাম ইয়াকুন ইনদাহু মা ইউতা মিনহু, বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-৩৪৯৮

www.pathagar.com

আইন অনুযায়ী তিন কিলোমিটারের মধ্যে যদি ফসলি জমি, ঘরবাড়ি বা ফলদ গাছ থাকে, তবে সেখানে ইটখোলা তৈরি করা অবৈধ। বাস্তবে দেখা যায়, ফসলি জমি ও বসতবাড়ির গা ঘেঁষেই তৈরি হচ্ছে ইটখোলা। ইট তৈরির প্রধান উপকরণ হলো জ্বালানি। এ কাঠ সংগ্রহে বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৯ (সংশোধিত ২০০১)-এর ৫ ধারা মোতাবেক 'কোনো ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করবেন না।' সম্প্রতি এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশে এখন প্রায় ৯ হাজার ইটখোলা, যার ৯৫ শতাংশ জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করে। ফলে এ দেশে অনিবার্যভাবেই বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফান ফ্রিজনার বলেছেন, ইট তৈরির জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করছে ইউএনডিপি। তিনি আরো বলেন, প্রতিবছর ৩৬ মিলিয়ন একর প্রাকৃতিক বনভূমি মানুষের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। ফলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ২০ শতাংশ, যা জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলো দায়ী। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের কাছে আমরা কি ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারি? হ্যাঁ পারি, তবে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না পাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্ভরশীল। কারণ আমরা যখন ক্ষতিপূরণ চাইব, তখন তারা প্রশ্ন তুলবে আমরা আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণরোধে কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি বা দূষণ রোধ করতে পেরেছি। তাই ক্ষতিপূরণ তখনই পাব, যখন আমরা আমাদের দেশে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারব। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী, পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

এ রকম কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে বাস্তবে তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না। জাতিসংঘের (ইউএনইপি) কর্তৃক নির্ধারিত ২০১২ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সবুজ অর্থনীতি : আপনিও অন্তর্ভুক্ত'।[৪৯] বাংলাদেশে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'পরিবেশ উন্নয়নে আপনিও গর্বিত অংশীদার হোন' বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি কেবল এ বছরের জন্য নয়, বরং এ দেশের পরিবেশ রক্ষায় একটি কার্যকর পদক্ষেপের সূচনা হতে পারে। সর্বোপরি আমাদের সবাইকে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে সচেতন হতে হবে, বেশি করে গাছ লাগাতে হবে, পরিবেশ

عبد الله بن وهب بن منبه عن أبيه قال : حدثني فتح قال فقال الرجل : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بأذني هاتين يقول : من نصب شجرة فصبر على حفظها و القيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز و جل

৪৯. http://www.unep.org/wed/theme/ Visited on 16-06-2012

www.pathagar.com

অধিদপ্তর ও প্রশাসনকে অত্যন্ত স্বচ্ছতা, দৃঢ়তার সঙ্গে পরিবেশ আইনের বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই কেবল এ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

সমস্যা নিরূপন এবং এর সমাধান

দুর্বল পরিবেশ আইন : পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের ঘটনার তুলনায় আদালতের সংখ্যা কম হলেও ওই দুটি আদালতে যথেষ্ট মামলা নেই। বিচারকদের পরিবেশ আইনে দায়ের করা মামলা ছাড়া ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করতে হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি হলেও দেশের তিনটি পরিবেশ আদালতে মামলা হয় না বললেই চলে। এর জন্য পরিবেশ আইনের দুর্বলতাকে দায়ী করেছেন আইনজীবীরা। পরিবেশ নষ্টের কারণে নদী দূষণ, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণের মাত্রা বেড়ে গেছে। পরিবেশ আইন অমান্য করে অনেক ইটখোলায় গাছ পোড়ানো হচ্ছে। আবাসিক এলাকায় গার্মেন্টস, শিল্প কারখানা, হাসপাতাল গড়ে উঠছে, বন উজাড় হচ্ছে। কিন্তু আদালতে মামলা নেই। পরিবেশ আইন অনুযায়ী সারা দেশে পরিবেশ আদালত করা হয়েছে দুটি। আর পরিবেশ আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি। এ তিনটি আদালত যথেষ্ট নয় বলেই দেশের ৬৪ জেলায় পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ৫ জুন ২০১২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এ কথা জানিয়েছেন।

১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বিচারকাজ চালানোর জন্য ২০০০ সালে পরিবেশ আদালত আইন করা হয়। ঐ আইন অনুযায়ী ২০০২ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয় দুটি পরিবেশ আদালত। যুগ্ম জেলা জজ ওই আদালতের বিচারক। আর পরিবেশ আপিল আদালতে জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারক বিচারকাজ পরিচালনা করেন। জেলাপর্যায়ে মামলা হলে সেগুলো বিভাগীয় আদালতে স্থানান্তর করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া পরিবেশ আদালতে কোনো মামলা করা যায় না। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৮ (১) অনুযায়ী পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত যেকোনো ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহাপরিচালককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবেন। একই আইনের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে, মহাপরিচালকের প্রতিনিধি বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ বিচারের জন্য আদালত আমলে নেবেন না। এ কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত কেউ মামলা করতে যান না। ২০০২ সালে আদালত প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রাম পরিবেশ আদালতে ২০০৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর একটি পরিবেশ মামলার রায় হয়েছে। রায়ে পাহাড় কাটার অপরাধে এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দুই লাখ টাকা জরিমানাও করা হয়। পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী এ রায়টিই ছিল চট্টগ্রাম পরিবেশ আদালতের প্রথম রায়।

www.pathagar.com

আদালত প্রতিষ্ঠার সাত বছর পর প্রথম মামলার রায়ই প্রমাণ করে ওই আদালতের মামলার সংখ্যা কত। ঢাকার পরিবেশ আদালতে পরিবেশ আইনে দায়ের করা মামলার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০০৩ সালে এ আদালতে মামলা হয়েছে ১৭টি। ২০০৪ সালে ৭২টি, ২০০৫ সালে ২৩টি, ২০০৬ সালে ৩৭টি, ২০০৭-এ মাত্র চারটি, ২০০৮-এ ৯৭টি এবং ২০০৯ সালে ৮২টি মামলা হয়।[৫০] ২০১২ সালের প্রথম পাঁচ মাসে ৩০টি মামলা দায়ের হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।[৫১] পরিবেশ আপিল আদালতে পরিবেশ-সংক্রান্ত মাত্র ছয়টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন। উপরে উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও নিম্নলিখিত কারণগুলোও পরিবেশ আইন সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে বলা যায়।

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি কার্যক্রম ও পরিকল্পনা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো জনগণকে জানানোর কোনো পদ্ধতি যেমন নেই, তেমন উদ্যোগও নেই।
- পরিবেশ আইন, নীতি বা বিধিমালায় পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার কোনো বিধান নেই।
- পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই।
- পরিবেশ আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকার পেতে চাইলে সর্বপ্রথম তাকে পরিবেশ অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে হয়, সরাসরি পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে না।
- দেশের দুটি বিভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবেশ আদালতের কার্যক্রম থাকলেও রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে এখন পর্যন্ত কোনো পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমগ্র দেশের জন্য একটি মাত্র পরিবেশ আপিল আদালত মোটেও পর্যাপ্ত নয়।
- পরিবেশ অধিদপ্তরে অপর্যাপ্তসংখ্যক পরিদর্শক রয়েছেন। ফলে পরিবেশ আদালতের কাজ সুষ্ঠু ও যথাসময়ে নিস্পত্তি ব্যাহত হচ্ছে।
- ধর্মীয় মূল্যবোধ এর অভাব।
- ধর্মীয় আইনের উপর মনুষ্য তৈরী আইনকে প্রাধান্য দেয়া।

---

৫০. *দৈনিক প্রথম আলো*, http://www.prothom-alo.com/

৫১. দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর নিম্ন আদালত সংবাদদাতার মাধ্যমে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

উপসংহার

জীবমণ্ডলের লাখ লাখ প্রজাতির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সৃষ্টিকর্তা, মানবজাতি এবং সৃষ্টি এই তিনের মধ্যে একটি অলিখিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বিদ্যমান। মহান আল্লাহ এই সৃষ্টি জগতের সবকিছু মানুষের জন্য তৈরী করেছেন এবং তাকে নিযুক্ত করেছেন এর প্রতিনিধি হিসেবে (খলিফা)। এটি মানুষের নিকট আল্লাহর একটি আমানত স্বরূপ। তিনি ইরশাদ করেন, "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদকারী বানিয়েছে"।[৫২] তিনি আরও বলেন-"আমি তো আসমান, যমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, উহারা ইহা বহন করতে অস্বীকার করল এবং উহাতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ"।[৫৩] আর দায়িত্ববোধের এই অনুমান থেকেই মনুষ্যজাতিকে তাদের কাজের দায়ভার বহন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে"।[৫৪] তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী"।[৫৫] আর আমরা মানুষ যখন সীমালঙ্ঘন করি তখনই আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ দেন সুনামি, হারিকেন, সাইক্লোন এর মত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেন মুমিন বান্দাগণ আবার ফিরে আসেন আল্লাহ তাআলার কাছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এরকম গুরু দায়িত্ব যে মানুষের উপর অর্পিত সে মানুষেরই অবিবেচক আচরণ ও অবহেলার কারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে তার চারপাশের পরিবেশ। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভারসাম্যহীন ও ভয়াবহ এই পরিবেশ দূষণের ফলে ধ্বংস হচ্ছে মাটি, পানি, গাছপালা, বন, কীটপতঙ্গ, প্রাণী ইত্যাদি। মোদ্দাকথা, পরিবেশ সংরক্ষণে পর্যাপ্ত আইন, এর সঠিক প্রয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে ইসলামী বিধানগুলোর বহুল প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং সমন্বিত চিন্তাচেতনাই টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে পারে।

---

[৫২]. আল-কুরআন, ১১ : ৬১ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

[৫৩]. আল-কুরআন, ৩৩ : ৭২ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

[৫৪]. আল-কুরআন, ১৩ : ০৮ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

[৫৫]. আল-কুরআন, ৫৪ : ৪৯ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৩

বাংলাদেশে মাদক ও মাদকাসক্তির বিস্তার ও প্রভাব : উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ড. মোঃ শামছুল আলম *
সৈয়দ আমিনুল ইসলাম **

[**সারসংক্ষেপ:** *মাদকাসক্তি (Drug addiction) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব বাংলাদেশেও বয়ে চলেছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বায়নের সুফল নিয়ে বিশ্বে মানবকল্যাণমুখী অগ্রগতি ও পরিবর্তন আসছে দ্রুত ঠিকই। পাশাপাশি বিশ্বায়নের কুফল হিসেবে মানব জীবনের জন্য ক্ষতিকর কিছু উপাদান দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এসবের মধ্যে মাদক দ্রব্য অন্যতম। পৃথিবীর সকল দেশেই সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে মাদকাসক্তি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে ওঠেছে। আশঙ্কাজনকভাবে একদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু অন্যদিকে বেসরকারিকরণ এমনিভাবে ঘটছে যে, মাদক নিয়ন্ত্রণকারী, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও এ দেশের সরকারের পক্ষে বৈধ-অবৈধ আলাদা করা ও এটা রোধ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। যার সুবাদে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মারামারি, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার, সন্ত্রাস, অত্যাচার ইত্যাদির ন্যায় ঘৃণিত সামাজিক অবক্ষয় এখন আমাদের এক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। মাদকাসক্তির কারণে তরুণ ও যুব সমাজে ধরেছে এমন পঁচন যা ব্লাড ক্যান্সারের চেয়েও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য AIDS নামক ঘাতক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের যুব সমাজের এক বিরাট অংশকে এ সমস্যা অকর্মণ্য ও অবচেতন করে ফেলেছে। মাদক সেবন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ইসলাম সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই মাদকাসক্তির বিস্তার রুখতে হলে প্রয়োজন ইসলামী নীতির অনুসরণ, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ এবং গণমানুষের সচেতনতা।*]

মাদক ও মাদকাসক্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

যেসব প্রাকৃতিক, রাসায়নিক দ্রব্য বা উপাদান গ্রহণ করলে স্নায়ুবিক উত্তেজনা, কিছুটা মানসিক প্রশান্তি ও সাময়িক আনন্দ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তাই হলো মাদকদ্রব্য। আর বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নির্ভরতাই হচ্ছে মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন একটি অবস্থা যাতে ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি ব্যবহারকারীর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা জন্ম নেয়, এর প্রতি আকর্ষণ ও ব্যবহৃত মাত্রার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ ও চিন্তার প্রক্রিয়াকে পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে।

---

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** পিএইচ ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

মাদকাসক্তি শব্দটি যুগল শব্দ। যার একটি হলো মাদক, অপরটি হলো আসক্তি। অর্থাৎ মাদক + আসক্তি = মাদকাসক্তি। মাদক শব্দটি মদ শব্দের বিশেষণ। মাদক অর্থ মত্ততা জন্মায় এমন (মাদকদ্রব্য)। আর মাদকতা (বি) অর্থ মত্ততা বা নেশা উৎপাদন শক্তি।[১] আর ইংরেজি প্রতিশব্দে মাদক অর্থ intoxicating; inebriant; addictive; stupefying. অর্থাৎ মাদক অর্থ durg; intoxicant.[২] আর আসক্তি হলো বিশেষ্য পদ। যার অর্থ গভীর অনুরাগ, লিপ্সা, পাওয়ার দুর্দমনীয় প্রত্যাশা। অর্থাৎ মাদকাসক্তি অর্থ হলো নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ বা পাওয়ার দুর্দমনীয় প্রত্যাশা। অন্য কথায় বলা যায়, যা পাবার জন্য মনপ্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে তাই হলো মাদক নেশা। আর মাদকদ্রব্যের প্রতি যার আসক্তি রয়েছে তাকেই বলে মাদকাসক্ত।[৩]

যে কোন ধরনের নেশা বা আসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আসক্তি হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিশনের (Neurotransmission) স্ব-আবেশিত এমন এক পরিবর্তন যা সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণের জন্ম দেয়।[৪] মাদকাসক্তি সম্পর্কে অনেক মতামত পাওয়া যায়। যেমন-ইমাম আযম আবু হানীফা র. বলেন, "মাদকাসক্তি বা নেশা হলো যার সাথে 'হল' ও 'নিষেধাজ্ঞা' সম্পৃক্ত। উহা জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে, এমনকি মাতাল ব্যক্তি কোন কিছু বোঝে না, কথাবার্তায় জ্ঞান থাকে না, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।"[৫]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দৃষ্টিকোণ থেকে, "মাদকদ্রব্যের উপরে আসক্তি বা নির্ভরশীলতা হচ্ছে একটি মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যার উপর নির্ভরশীলতা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয় তখন সে মাদকদ্রব্য সেবনের অবর্তমানে উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে সে যে কোনো অপরাধ সংঘটন করতে পারে। মাদকদ্রব্যের অর্থ সংকুলানের জন্য যা খুশি তা করতে পারে। এক কথায় মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অবিরাম বা পর্যায়ভিত্তিক নেশাগ্রস্ততা যার ফলস্বরূপ ক্ষেত্র মতে এক বিশেষ মাদকদ্রব্য

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৯২৫

২. Mohammad Ali and others (ed.), *Bengali-English Dictionary,* Dhaka : Bangla Academy, 2000, p. 659

৩. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন প্রমুখ, *'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যা: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি;* ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মে সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ৩

৪. এ.কে. নাজিবুল হক, *মন ও মনোবিজ্ঞান,* ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২০০

৫. ড. ওয়াহাবা আয যুহায়লি, *আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* দামেস্ক : দারুল ফিকরি মুআমির, ২০০৬, পৃ. ৫৪৮৬

www.pathagar.com

অবশ্যই নিয়মিতভাবে সেবন করতে হয়। ক্রমাগত মাদকদ্রব্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনের তাড়নায় সাধু বা অসাধু যেকোনো উপায়ে হোক ঔষধ যোগাড় করতে হয়। শারীরিক, মানসিক বা উভয়ভাবে এই মাদক ক্রিয়ার উপরে নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগতভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সাথে বৃত্তিমূলক দিকের অবনতি হতে থাকে।"[৬]

মাদকাসক্তির ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে, "The concept of drug addiction is concerned with three terms–tolerance, physical dependence and habituation. Tolerance is a physiological survival mechanism of the body in which an organism adopts to a drug and thus becomes better able to withstand continual exposure to its toxic substance."[7]

মাদকাসক্তিকে এইডস, ক্যান্সার বা হার্টের অসুখের চেয়েও ভয়াবহ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, Drug addiction of course is manifested as a state in which a person has lost the power of self control with reference to a drug and abuses the drug to such an extent that the person or society is harmed.[8]

১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী–মাদকাসক্ত বলতে এমন একজন মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীকে বুঝায়, যে অভ্যাসগতভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, মাদকদ্রব্য সেবন কিংবা গ্রহণ যেন তার নিকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔষধের সমতুল্য। মাদকদ্রব্য গ্রহণ তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে, ধ্বংস ও অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়।[৯]

সুতরাং মাদকাসক্তি বলতে বুঝায়, কোনো ব্যক্তি প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি মাদক জাতীয় দ্রব্য কোনো কারণ ব্যতীত বার বার সেবন করে এবং উক্ত মাদকের উপর শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, "Drug addiction means strong attraction for any harmful things. In this sense taking tea, coffee, smoking and drinking alcohol may be called addiction. Now a days drug addiction means taking opium, heroine, cocaine, marijuana, morphine etc."[১০]

---

৬. এ.কে. এম. মনিরুজ্জামান, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯, পৃ. ১

৭. B. Klienmuntj, *Essentials of Abnormal Phycology*, NewYork : Herper & Row Publishers, 1974, p. 39

৮. Bacher (ed.), *The Foundation of Health*, NewYork : Meredith Publishing Company, p. 134

৯. আব্দুল মতিন, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন*-১৯৯০, ঢাকা : মাদল প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৪

১০. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, *সমাজকল্যাণ অনুক্রম*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯১

www.pathagar.com

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা যার ফলে, রোগী ড্রাগের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ ব্যবহারে ভালো লাগার আমেজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের ইচ্ছা। এভাবে পুনঃপুনঃ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে ব্যবহারকারীকে ড্রাগের মাত্রা বাড়াতে হয়। এভাবে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ড্রাগ ব্যবহার না করলে শরীরে প্রত্যাখ্যানজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর এরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় ড্রাগের দিকে। ফলে আসক্ত ব্যক্তি একমাত্র ড্রাগ ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের বাকি সব চাহিদা, দায়িত্ব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ড্রাগ ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলেও পরবর্তীতে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় আরো ড্রাগ সংগ্রহ ও ব্যবহার। এভাবেই তার পরিণতি হয় মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক জটিলতা, যার পরিণাম মৃত্যু।[১১]

মাদকদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

নেশা সৃষ্টিকারী বা চিত্তবিভ্রাটকারী দ্রব্যসমূহ মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। পূর্ব প্রচলন ছাড়া বর্তমানে মাদকদ্রব্য হিসেবে নতুন নতুন নামে বা পদার্থে বেশ কিছু দ্রব্য মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। মাদকদ্রব্য দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) প্রাকৃতিক (খ) রাসায়নিক।

(ক) প্রাকৃতিক : প্রাকৃতিক উপায়ে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাই প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য। প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য গাছ থেকে আসে যেমন : তাড়ি, আফিম, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক : পরীক্ষাগারে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয় তা-ই রাসায়নিক মাদকদ্রব্য। রাসায়নিক মাদকদ্রব্য প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন মাদকদ্রব্য থেকে বেশী নেশা সৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকর। যেমন : হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেডিন, ফেনসিডিল, সঞ্জীবনী সূরাসহ বিভিন্ন প্রকার এলকোহল ইত্যাদি।[১২]

অধুনাকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ভরতা সৃষ্টিকারী ঔষধের এক আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাজন করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. আচ্ছন্নভাব উদ্রেককর মাদক ; যেমন :
   (ক) আফিম ধরনের ; যথা-মরফিন, হেরোইন, পেথেডিন, কোডেইন, মিথাডন ইত্যাদি।
   (খ) বার্বিচ্যুরেট ধরনের ; যথা-গার্ডিনাল, সোনেরিল, ক্লোরাল, মেপ্রোবামেট, ডায়াজিপাম, মেথাকোয়ালোন প্রভৃতি।

---

[১১]. আবদুল হাকিম সরকার প্রমুখ, 'বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা : সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৫৬, ১৯৯৯, পৃ. ২০৬–২০৭

[১২]. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ই আগষ্ট, ২০০৮

www.pathagar.com

২. উত্তেজক ধরনের মাদক ; যেমন :
   (ক) ক্যানাবিস জাতীয় ; যথা-গাঁজা, চরস, ভাঙ, সিদ্ধি ইত্যাদি।
   (খ) অ্যামফিটামিন জাতীয় ; যথা- মেথেড্রিন, ডেক্সিড্রিন, ফেনপ্রোরামিন ইত্যাদি।
   (গ) কোকেন জাতীয় ; যথাঃ কোকেন বড়ি বা নস্যি।
৩. ভ্রম বা মায়া উৎপাদনকারী মাদক ; যথা-এল.এস.ডি মেসক্যালিন।
৪. বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ; যেমন :
   (ক) যন্ত্রণানিবারক ঔষধ ; যথা- অ্যাসিপিরিন, পেন্টাজেনিন ইত্যাদি।
   (খ) পেট্রোলিয়াম উদ্ভূত দ্রব্যঃ যথা-আটা শোঁকা, পেট্রোল শোঁকা, জুতো পালিশ শোঁকা ইত্যাদি।[১৩]

বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য

গাঁজা, হাশিশ, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকোন, ক্যাফেইন, অ্যামফেটামিন, বার্বিচ্যুরেট, মেথাকোয়ালেন, ট্রাংকুইলাইজার্স, এলএসডি, পেথেডিন, আফিম, কোডিন, থিবাইন, প্যাপারাভিন, নোসকাফাইন, নারকটিন, মেথাডন, ডেকাট্রোমোবামাইড, ডাই-পিপানল, ডাই-হাইড্রোকোডিন, পেন্টানাইল, কেন্টাযোকাইন, আলফা প্রোডাইন, হাইড্রোমরফাইন, অ্যালফেন্টানাইল, আলফামিথাইল, ফেন্টানালই, সুপেন্টানাইল, লোফেন্টানাইন, এন্ট্রোফাইন, অক্সিকোডন, ডিমেরাল, ক্যানাবিস, রেসিন, মদ, হুইস্কি, জিন, রাম, ভদকা, তাড়ি, পচাই, সুরাসার, ডিনেচার্ড, স্পিরিট বা মেথিলেটেড স্পিরিট, ক্লোরডায়াজিপক্সাইড, ডায়াজিপাম, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, ফরাজিপাম, ক্লোরোজিপেট, ফেন্সিডিল, নাইট্রাজিপাম, ট্রায়াজেলাম, ট্রেমাজিপাম, ইয়াবা ইত্যাদি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য।[১৪]

কয়েকটি মাদকদ্রব্যের পরিচিত

গাঁজা : গাঁজা বা ক্যানবিস হচ্ছে এক ধরনের নেশা জাতীয় উদ্ভিদ। এর ল্যাটিন নাম "ক্যানবিস স্যাটাইভা"। এতে রয়েছে টি.এইস.সি বা 'টেট্রোহাইড্রোক্যানাবিনল' নামক এক সক্রিয় উপাদান যা ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনার পরিবর্তন ঘটায় এবং মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে।

হেরোইন : আফিম থেকে প্রস্তুত একটি মারাত্মক মাদকদ্রব্যের নাম হেরোইন। সাধারণত সাদা অথবা বাদামী রঙের পাউডার আকারে পাওয়া যায়। 'চেজিং দ্যা ড্রাগন' পদ্ধতিতে ধুমপানের মাধ্যমে হেরোইনের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেয়া হয়। এর ফলে নেশার সৃষ্টি হয়।

কোডিন : কোডিন আফিম থেকে উদ্ভূত একটি উপজাত দ্রব্য। বেদনা-নাশক অথবা কাশি দমনকারী ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এলিকসার,

---

[১৩]. *সাপ্তাহিক রোববার*, সংখ্যা-২১, এপ্রিল-২০০৪, পৃ. ৩০
[১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

www.pathagar.com

সলিউশান আকারে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কোডিন ফেনসিডিলের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেনসিডিল : ফেনসিডিল একটি কাশির ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে আফিম থেকে উদ্ভূত কোডিন ফসফেট। এ ওষুধ বাংলাদেশে অবৈধ হলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশে বৈধ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে আসে। এটা একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এর গন্ধ তীব্র। বাংলাদেশে এর ব্যবহারকারীদের নিকট এটি 'ডাইল' বা ফেনসিডিল নামে পরিচিত।

পেথেডিন : পেথেডিন বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি ঔষুধ জাতীয় মাদকদ্রব্য। এটি সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে তৈরী ঔষুধ যা সাধারণত ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। একাধিক ব্যক্তি একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে বলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি/সি এবং এইচআইভি/এইডস বিস্তার লাভ করে।

আফিম : পপি গাছের ফল থেকে কষ সংগ্রহ করে আফিম প্রস্তুত করা হয়। খয়ের বা পিচের আকৃতিবিশিষ্ট গাঢ় বাদামী রংয়ের পিণ্ড বা খণ্ড আকারে পাওয়া যায়। গিলে খাওয়ার বা ধুমপানের মাধ্যমে আফিম গ্রহণ করা হয়। আফিমের গন্ধ তেঁতুলের মতো, স্বাদ অত্যাধিক তেতো। বৃটিশ আমল থেকে এদেশে আফিমের প্রচলন ছিল।

মরফিন : আফিম থেকে উদ্ভূত বেদনা-নাশক ঔষুধরূপে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। ইনজেশনের জন্য, সলিউশনের আকারে এবং ট্যাবলেট বা সাপোজিটরি আকারেও পাওয়া যায়। এটি পেথেডিনের মতোই মারাত্মক আসক্তির সৃষ্টি করে থাকে। এর গন্ধ তেঁতুলের মতো, দেখতে ইটের গুড়ার মতো লালচে।

ট্রাংকুলাইজার : টেনশন, উদ্বেগ বা অস্থিরতা অথবা নিদ্রাহীনতা লাঘবে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষুধ। এ ধরনের ঔষুধ অপব্যবহার হলে মস্তিস্ক ও শরীরের ক্রিয়া ক্ষীণ হয় ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে সুপরিচিত কয়েকটি ট্রাংকুলাইজার হলো ডায়াজিপাম, ক্লোবাজাম, ক্লোনানিপাম ইত্যাদি।

ইয়াবা : 'Yaba' ইয়াবা শব্দটি থাই শব্দ (Yar ev bah) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো 'Crazy Madicine' বা উত্তেজক ওষুধ। উত্তেজক মাদক (Amphetamine) এর অ্যানালগ Metham Phetamine সঙ্গে আরো কতিপয় যৌগ-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইয়াবা তৈরি করা হয়। রাসায়নিক চরিত্র, শক্তি, কার্যকারিতা, প্রতিক্রিয়া বিচারে অ্যামফিটামিন, মেথামফিটামিন কিংবা কোকেনের চেয়েও ইয়াবা শক্তিশালী উচ্চমাত্রার উত্তেজক মাদকদ্রব্য। সাধারণত ৪ থেকে ৫ মি.মি. ব্যাস এবং আড়াই থেকে ৩ মি.মি. পুরু গোলাকৃতির ট্যাবলেট আকারে এটি তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা ছোট আকারের ক্যান্ডির মতো। এর রং লালচে, কমলা, কিংবা সবুজাভ। এটি আঙ্গুর, কমলা, ভ্যানিলা ইত্যাদি স্বাদ ও গন্ধের হয়ে থাকে। এ কারণে কোমলমতি শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদেরকে শক্তিদায়ক ক্যান্ডি বলে বিভ্রান্ত করে সহজে ধরিয়ে দেওয়া যায়। এর গায়ে "WY", "R", "OK",

www.pathagar.com

"SY" ইত্যাদি লোগো অঙ্কিত থাকে যা দেখে ব্যবহারকারীরা সহজে একে সনাক্ত করতে পারে। ইয়াবা পাউডার আকারেও তৈরি হয়। ইয়াবা সেবন করলে ২ বা ৩ ঘন্টার মধ্যে স্নায়ু উত্তেজক ক্রিয়া শুরু হয়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা স্থায়ী হয়। মাদকের প্রভাব কেটে যাবার পর ব্যবহারকারী দ্বিগুণ পরিমাণে ভেঙে পড়ে। তার মধ্যে নেমে আসে নিস্তেজতা, নিঃস্বতা ও অসারতা।[১৫]

মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী

মাদকাসক্তির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

* যারা মাদকাসক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে মাদক গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা প্রবল মাত্রায় বর্তমান থাকে।
* নিয়মিত নেশা গ্রহণের সাথে সাথে নেশা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়।
* মাদক গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, আসক্ত ব্যক্তির কাছে তার প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান।
* নেশা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাদক গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।
* আসক্ত ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, চিন্তনসহ অন্যান্য কর্মক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
* মাদকাসক্তি সমস্যা শুধু ব্যক্তির একার সমস্যা নয়। এটা ব্যক্তি, দল, পরিবার, সমষ্টি ও গোটা সমাজের জন্য সমস্যা।
* মাদকাসক্তি সমস্যার সাথে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম জড়িত থাকে। যেমন-চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন, পতিতাবৃত্তি, পুরুষদের পতিতালয়ে গমন ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, বিবাহ বিচ্ছেদসহ পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি।
* আসক্ত ব্যক্তির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং দৈহিক কর্মকাণ্ডের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।
* প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক অসঙ্গতির কারণে আসক্তদের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

মাদক ও মাদকাসক্তির আদিকথা

মাদকদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ অতি পুরনো। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল- কখনো নির্জলা আনন্দের উপাদান হিসেবে, কখনো বা ধর্মীয় উৎসবে। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অভ্যাসগুলোর চাইতে পুরনো। তারা মনে করেন, All the naturally occuring sedatives, narcotics, euphoriants, hallucinations and

---

[১৫]. মোঃ আবু তালেব, *ইয়াবা : পরিচিতি ও পরিণতি*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭২

www.pathagar.com

excitants were discovered thousands of years ago, before the dawn of civilization ... by the late stone age man was systematically poisoning himself ... there were dope addicts long before there were farmers.[১৬]

মাদকাসক্তি মানব সভ্যতার একটি জটিল ও পুরোনো সামাজিক ব্যাধি। চিকিৎসা শাস্ত্র বিকাশের সাথে এর গভীর যোগাযোগ রয়েছে। আমরা যাকে 'ড্রাগ' বলি প্রাচীন গ্রীসে একে বলা হতো Pharmacon; যার প্রচলিত অর্থ দাঁড়ায় বিষ ও ঔষধ। উদ্ভিদ থেকে তৈরী ড্রাগ দ্বারা চিকিৎসা করার রীতি তখনো প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে চিকিৎসা জগতে অত্যন্ত মূল্যবান ও কার্যকরী ঔষধ হিসেবে আফিমের ব্যবহারের কথা জানা যায়। চিকিৎসার পাশাপাশি অবসাদমুক্ত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি ও সুখকর বিনোদন হিসেবেও আফিমের ব্যবহার হয়ে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে।[১৭] প্রাচীন শিলালিপির তথ্যানুযায়ী পণ্ডিতগণ মনে করেন ৬,০০০ বছর পূর্বে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যুগে আফিয়াম পপিকে আনন্দ উদ্দীপক নেশা হিসেবে ব্যবহার করা হত।[১৮] এভাবে প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৪,০০০ উদ্ভিদজাত বিভিন্ন সাইকো এ্যাকটিভ ড্রাগসের নাম জানা গিয়েছে। এগুলোর মাঝে প্রায় ৪০ প্রকার উদ্ভিদ রয়েছে যা মানুষকে নানাভাবে আসক্ত করে তুলতে সক্ষম।

চিকিৎসার প্রয়োজনে, সামাজিক বিনোদন, ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে এবং তান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার অনুষঙ্গরূপে দীর্ঘদিন ধরে মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আদিবাসীদের মধ্যে উদ্ভিদ থেকে তৈরি ড্রাগ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। হেরোডোটাস, হিপোক্রাটিস, এরিস্টটল থেকে ভার্জিল, প্লিনি, এন্ডারসহ বহু প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকের লেখায় চিকিৎসার জন্য পপি ও আফিম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৯] মেসোপটেমিয়া, এশিয়া ও ইউরোপে ঔষধ হিসেবে আফিমের ব্যবহার শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে। ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে মিসরের চিকিৎসকগণ আফিমের ব্যবহার করত এ্যানেসথেটিকরূপে। সেখানকার আদিম অধিবাসীগণ তখন কোক পাতা চিবিয়ে খেত। মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানগণ খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে ধর্মীয় উৎসব ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য Hallucinogenic Psitocybin mashroom's নামক উদ্ভিদের নির্যাস গ্রহণ করত; যাকে তারা বলত 'ঈশ্বরের দেহমাংস'। ফনীমনসা

---

১৬. A Huklety, *The doors of perception,* London : Chatto & Coindus, 1954, p. 67

১৭. *Narcotics Control Bulletin,* No-5, Department of Narcoties Control, Dhaka : Ministry of Home Affairs, 1992, p.35

১৮. A Tyler, *Street Drugs,* London : Name of Publishers,1957, p. 36

১৯. এ.ই. হক, *মাদকাসক্তি : জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষিত,* ঢাকা : ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ২৮

www.pathagar.com

জাতীয় (Pyote) গাছের নির্যাসও তারা ব্যবহার করত। আমেরিকার গির্জাগুলোতে Pyote ক্যাকটাস ব্যবহারের নিয়ম ছিল।[২০]

খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যুগে এশিয়ার মাইনরে আফিম ও পপিকে আনন্দ উদ্দীপক নেশা হিসেবে ব্যবহার করত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাইওয়ানে প্রস্তর যুগের ১০,০০০ বছর পূর্বেও গাঁজার ব্যবহার ছিল। চীনে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে 'মাহুয়াং' নামক ড্রাগ 'ইনথেলেন্ট' রূপে ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রায় একই সময়ে চীনে সম্রাট সেনমুঙ্গ-এর শাসনামলে নেশাকর ড্রাগ হিসেবে গাঁজার ব্যবহার ছিল। প্রাচীনকালে চীন ছাড়াও পারস্য, তুরস্ক, মিসর, ইটালী, জার্মানি এবং অন্যান্য দেশে গাঁজার ব্যবহার ছিল।[২১]

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্যানাবিসের প্রচলন শুরু হয়। সম্ভবত ভারতীয়রাই আফিম, ধতুরা এবং ভাঙ ব্যবহারের সূচনা করে। বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু সাধক ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ক্যানাবিস ব্যবহার করতেন। এটি সম্ভবত ধ্যানে মগ্ন বা মনকে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করত। ক্যানাবিস এক ধরনের পানীয় হিসেবে বহু মন্দিরে পরিবেশন করা হত। ক্যানাবিস বিভিন্ন উৎসবাদি যেমন হোলি, শ্রীভারতী এবং বিবাহ উৎসবে ব্যবহার করা হত।[২২]

সাধু-সন্ন্যাসী, বাউল, যোগী, তান্ত্রিক ইত্যাদি ধরনের লোক গাঁজা, ভাঙও সিদ্ধি সাধনায় 'একাগ্রতা সৃষ্টি ও ধ্যানস্থ' হওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন পুরাণ ও উপকথায় নানা প্রসঙ্গে গাঁজার কথা পাওয়া যায়।[২৩] হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পুরাণ-এ ধর্মীয় মর্যাদা প্রদান করে বলা হয়, ইন্দ্র তাঁর সহস্র চক্ষু, রোগ নাশক শক্তি ও দৈত্যনাশক ক্ষমতা দিয়েছেন এই গাঁজাকে। সেই থেকে হিন্দুদের কাছে গাঁজা গাছ 'পবিত্রতার' প্রতীক হয়ে আছে। তাদের কাছে স্বপ্নে গাঁজা গাছ-এর পাতা দেখা সৌভাগ্যস্বরূপ। বেদ-এ গাঁজা ও অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত পানীয় ভাঙকে দুশ্চিন্তানাশক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৪]

মাদকদ্রব্য সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে, "Nor does any one put new wine into old skin, if he does, the new wine will burst the skin, the wine will be wasted and the skin ruined fresh skins for new wine! And no one after drinking old wine wants new, for he says, the old wine is good."[২৫]

---

২০. শাহীন আকতার, *মাদকদ্রব্য ও বর্তমান বিশ্ব,* ঢাকা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১৯৯০, পৃ. ১১

২১. আব্দুল হাকীম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২৩. এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে নেশা,* ঢাকা : মা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৮৬

২৪. আবদুল হাকিম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২৫. The New English Bible, 1961, p. 100

www.pathagar.com

অজ্ঞতার যুগে অন্যান্য অপরাধ ও অপকর্মের পাশাপাশি মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুরা পান তখন আভিজাত্য বলে মনে করা হতো। প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে সুরা পান ছিল অপরিহার্য উপাদান। ইসলামের বিকাশ লাভের পূর্বে আরব দেশে সুরা পান ছিল একটি গ্রহণযোগ্য রীতি। কিন্তু নেশাগ্রস্ততা মানুষের জীবনে অনেক ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে বলে ইসলাম এর প্রতি পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানী কার্যের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"।[২৬]

যা হোক, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পপি ফুলের শুকনা রস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপরে পপি ফুলের রসের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গ্রীক ও রোমানগণ অবহিত ছিল। ইংরেজ ভেষজবিদ ১৭০০ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, অনেক দিন ধরে মাদকদ্রব্য সেবনে এর উপরে প্রচণ্ড আসক্তির জন্ম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কার হয় মরফিনের। মরফিন হচ্ছে আফিমের বিশুদ্ধ প্রকরণ। ১৮৯৮ সাল হতে হিরোইন ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ধমনীতে এর ইনজেকশন দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হেরোইন এ সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত এবং আলোচিত ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য, সাদা বা বাদামী রঙের পাউডারের মতো। মাদকাসক্তদের কাছে 'ব্রাউন সুগার' নামে বেশি পরিচিত। এ মাদকদ্রব্যটির মূল উৎস হচ্ছে আফিম।

পোপাভার সমনিফেরাম নামক এক ধরনের উদ্ভিদের ফুলের রস থেকে আফিম তৈরি হয়। ১৮০৫ সালে মাটারনাম নামে একজন বিজ্ঞানী আফিম থেকে আরো শক্তিশালী বেদনানাশক দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং গ্রীক নিদ্রাদেবী 'মার্ফিউস' এর নামানুসারে এর নাম দেয় 'মরফিন'। পরবর্তীকালে ১৮৯৫ সালে একজন জার্মান ফার্মাসিস্ট মরফিন থেকে অধিক গুণ শক্তিশালী বেদনানাশক দ্রব্য হেরোইন প্রস্তুত করেন। হেরোইনের নেশা মরফিনের তুলনায় ৩ গুণ এবং আফিমের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি।[২৭] গাঁজা তৈরি হয় ক্যানবিস স্যাটাইভা নামের এক ধরনের উদ্ভিদের পাতা, ডাল, ফুল ও বীজ থেকে। গাঁজাতে সাধারণত তামাকের চেয়ে ১২ গুণ টার ও ১০ থেকে ২০ গুণ কার্বন মনোক্সাইড বেশি থাকে, যার ফলে এ মাদকদ্রব্য সেবনে ফুসফুসে ক্ষত বা ক্যান্সারের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোকো পাতা হতে তৈরি হয় কোকেন। ১৫৩২

---

[২৬]. আল-কুরআন, ৫ : ৯০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[২৭]. মুহাম্মদ সামাদ, মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৪২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ১৪৯

www.pathagar.com

সালে পিজারো এটা আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ সালে কোকো পাতা থেকে কোকেন পৃথক করা হয় এ্যালকালোয়েড রূপে। ১৮৮৪ সালে সিগমন্ড ফ্রয়েড মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় কোকেনের ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে অস্ত্রোপচারের সময় এ্যানাসথেটিক রূপে কোকেনের ব্যবহার শুরু হয়।[২৮]

অ্যামফেটামিন এক জাতীয় কৃত্রিম ড্রাগ। ১৯৪০ সালে আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ও জাপান সরকার সৈন্যদের মানসিক অবসাদ দূর করে কর্মোদ্দীপক করে তোলার জন্য এ্যামফেটামিন চালু করে। কোকেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় ড্রাগ। ১৮৬৪ সালে দু'জন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফনমেরিং ও ফিশার বারবিচ্যুরেট আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ সাল হতে এটা ঔষুধ রূপে ব্যবহার হতে থাকে 'ভারনাল ট্রেড' নামে। ১৯৪০ সনে গবেষণায় ধরা পড়ে যে, এটা এক আসক্তিজনক দ্রব্য। ট্রাংকুলাইজারসের আবির্ভাব ঘটে ১৯৫০ সনে আমেরিকায়। উদ্ভিদের নির্যাস হতে তৈরি এই ঔষুধ ভারতবর্ষে শত শত বর্ষ ধরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৩৮-১৯৪৩ সনের মধ্যে সুইজারল্যান্ডের স্যানডোজ ল্যাবরেটরীর দু'জন কেমিস্ট ড. আলবার্ট হকম্যান ও ডব্লিউ এ স্টোল এল.এস.ডি আবিষ্কার করেন। এটা বন্দীদের নিকট হতে তথ্য বের করতে এবং শত্রুদেরকে অসমর্থ করতে ব্যবহৃত হয়। এটা চিকিৎসার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২৯]

বাংলাদেশে ধূমপানের সূত্রপাত হয় সম্ভবত চট্টগ্রাম বন্দরে পর্তুগীজদের আনাগোনার সাথে সাথে। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার চুরুটের ব্যবহার ফ্রান্স, স্পেন, বৃটেনসহ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৩০] তাই বলা যায়, অতীতকালে বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য বেদনানাশক উপকরণ হিসেবে গাঁজা, মদ প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এর সাথে সংযোজিত হয়েছে হেরোইন, প্যাথিড্রিন, ফেন্সিডিলের মতো মারাত্মক নেশাকর দ্রব্য। আর এই মাদকদ্রব্য ইতিহাসের ক্রমধারায় এখন শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে মাদকের বিস্তার ও ব্যবহার

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব, প্রতিক্রিয়া জানা এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে মাদকাসক্তি সমস্যা বিদ্যমান। ৬০০-১০০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত চর্যাপদে বাংলাদেশের প্রাচীন শুঁড়িখানায় গাছের ছাল-বাকল দিয়ে চোলাই মদ তৈরির তথ্য পাওয়া যায়।[৩১] বাংলাদেশে চোলাই মদ, তাড়ি, গাঁজা ইত্যাদির প্রচলন অনেক পুরানো হলেও এগুলোর ব্যবহার মূলত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদির

---

[২৮]. এ.কে. এম. মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[২৯]. প্রাগুক্ত

[৩০]. *Encyclopedia Britannica* (1978), Vol-20, p. 839

[৩১]. আবু তালেব, *হেরোইন : আর এক মারণাস্ত্র*, খুলনা : অমরাবতী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ..১৩৬

www.pathagar.com

মধ্যে সীমিত ছিল। ব্যাপকহারে মাদকের বিস্তার এবং প্রযুক্তির ছত্রছায়ায় লালিত আধুনিক নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার এদেশে খুব পুরানো নয়। সবচেয়ে ভয়াবহ নেশাজাতীয় দ্রব্য মরফিন বা হেরোইনের মত স্বর্গানন্দ উদ্রেককারী মায়াবিস্তারকারী নেশা দ্রব্যের অনুপ্রবেশ এদেশে ১৯৮৩ সালের দিকে ঘটে বলে অনুমান করা হয়।[৩২]

বর্তমানে আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, বিয়ার, ব্রান্ডি, হুইস্কি, কোকেন, আফিম, ডায়াজেনাস, নাইট্রোজেনাম ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্যের অনুপ্রবেশ বহিরাগত অপসংস্কৃতির হাত ধরে হয়েছে। বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তির ছত্রছায়ায় প্রস্তুত হয়ে সেগুলো আজ যুব সমাজকে সবচেয়ে বেশী আসক্ত করেছে; ধ্বংস করছে তাদের সত্ত্বাকে, দংশন করছে তাদের আত্মাকে। নেশাজাতীয় দ্রব্য মহামারী আকারে সবচেয়ে বেশী প্রবেশ করেছে তরুণ সমাজে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা সম্পর্কে তেমন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ১৫ লাখ থেকে ১৭ লাখ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতে এই সংখ্যা ১৫ লক্ষ যার মধ্যে ৭০% যুব সম্প্রদায় এবং ১০% নারী।[৩৩]

বাংলাদেশে মাদক ব্যবহারের ব্যাপক প্রসার ঘটে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন কারণে সমাজ ভারসাম্য চ্যুত হতে থাকলে শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত তরুণ সমাজ যে উৎসাহ উদ্দীপনায় যুদ্ধে নেমেছিল পরবর্তীকালে সেই উদ্দীপনা নানা কারণে গঠনমূলক দিকে না গিয়ে দিকভ্রষ্ট হয়। কলেজ ও জীবনাচরণের প্রভাবে অনেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে নতুনত্ব আনার চেষ্টা চালায়। অনুষঙ্গ বিষয় হিসেবে দেখা যায় নেশার ভুবনে তরুণদের বিচরণ। হাল ফ্যাশনের যুগে উচ্চবিত্ত, উচ্চ শিক্ষিত, কিছুসংখ্যক শহুরে পরিবারে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অনেকটা কালচারে পরিণত হতে চলেছে।

বাংলাদেশের ২৫-৩০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরাই সবচেয়ে বেশী মাদকাসক্ত। এ বয়সীরাই মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ। আবার এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। এদের মধ্যেই প্রায় ৭০ শতাংশ মাদকাসক্ত বলে মনে করা হয়। এদেশের যুব শ্রেণী আজ নানাবিধ আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। এদেশের শহুরে যুবশ্রেণীর মধ্যে এর প্রকোপ বেশী। তবে গ্রামে-গঞ্জেও নেশা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া ও খুলনা শহরের তরুণদের মাঝে নেশা গ্রহণের প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৩২]. *স্মরণিকা-মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস*, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭

[৩৩]. *যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিবেদন*, ১৯৯৪, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃ. ১৯

www.pathagar.com

শুধু ঢাকা শহরেই ১ লক্ষ মাদকাসক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৩৪] শুধু ঢাকার মোহাম্মদপুরেই ২২ হাজার মাদকাসক্ত রয়েছে বলে "মুক্তি" নামের একটি বে-সরকারী ক্লিনিক উল্লেখ করে।[৩৫] অন্য এক তথ্য অনুযায়ী কেবল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১২,০০০ জন হেরোইন আসক্ত। কয়েক বছর আগের তথ্যে দেশে ৬০,০০০ লাইসেন্স প্রাপ্ত মদ্যপায়ীর মধ্যে ৪০,০০০ তরুণ বয়সী বলে জানা যায়, আবার ১,০০০ জন মদ্যপায়ীর মধ্যে ১০ জনের বেশীর লাইসেন্স নেই।[৩৬] অন্য এক তথ্যে জানা যায় প্রতি ২,৪৪৩ জন মদ্যপায়ীর মধ্যে প্রায় ২৮৫ জন অর্থাৎ ১১.৬৭% ছাত্র।[৩৭]

পেশা অনুযায়ী মাদকাসক্তের হার[৩৮]

পেশা	শতকরা হার
বিভিন্ন কর্মচারী	৪৫%
ব্যবসায়ী	১৯%
চোরাচালানী	৫%
ছাত্রী	৬%
ছাত্র	৬%
বেকার	১৫%
অন্যান্য	৫%

মাদকাসক্ত ছাত্রদের প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য রয়েছে এই সারণিতে। প্রথম পর্যায়েই ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় ৬ শতাংশ। বিশ্বে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির হার ২% ভাগ; বাংলাদেশে এই বৃদ্ধির হার ৩.৮% অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ।[৩৯] ঠিক এই হারটির সাথে তাল মিলিয়ে বাড়তে থাকে এদেশের ছাত্রসমাজে মাদকাসক্তির প্রবণতাও। উপর্যুক্ত তথ্যাবলীর বেশিরভাগই আজ থেকে ১৫-২০ বছর পূর্বের। বর্তমানে এই সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনুমিত হয়। তবে বাংলাদেশে এ ব্যাপারে কোন ধারাবাহিক পরিসংখ্যান নেই বলে সঠিক তথ্য পাওয়া দুস্কর।

মাদকাসক্তির কারণ

মাদকদ্রব্যে আসক্ত হওয়ার পেছনে একক কোন কারণ দায়ী নয়। কিন্তু তারপরেও বলতে হয় এর মূলে রয়েছে এর সহজ প্রাপ্তি। পেছনে রয়েছে এক সংঘবদ্ধ মাফিয়া চক্র যারা সুকৌশলে এবং কেবল নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য এটিকে বাজারে ছাড়ছে।

---

৩৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশ সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৬৬

৩৫. এম ইমদাদুল হক, *মাদকাসক্তি : জাতীয় ও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত*, স্মরণিকা-১৯৯৬, পৃ. ১৫

৩৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২২ এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃ. ৪

৩৭. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা-৬৮*, ২০০০, পৃ. ১৭৮

৩৮. *স্মরণিকা-২০০০, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর*, পৃ. ২২

৩৯. *স্মরণিকা-২০০০, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর*, পৃ. ৩০

www.pathagar.com

একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতে, মাদকাসক্তি হল বাজার অর্থনীতির কুফল যেখানে একদল স্বার্থান্বেষী কালো টাকা লাভের আশায় সে কাজ করছে; পিছনে রয়েছে আরো নানা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ।[৪০]

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শহরায়ন ও নগরায়নের ফলে সৃষ্ট জটিলতা, ছাত্র-রাজনীতিতে ঢুকে পড়া কু-প্রভাব, রাজনীতিবিদদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া, আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া, সন্ত্রাস, হতাশা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি মানুষকে মাদকাসক্ত হতে সাহায্য করেছে। এছাড়া বন্ধু-বান্ধবের কু-সর্গ, পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক অস্থিরতা, মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হওয়া এবং মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা এগুলো সমাজে ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা বেশী। ধনীর দুলাল-দুলালীদের কাছে এটি আভিজাত্যের প্রতীক। সুখের হতাশায় মাদকদ্রব্যের সম্মোহনে হারিয়ে যেতে এরা ভালবাসে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। রক্ত প্রবাহে মাদকদ্রব্যের জৈব রাসয়নিক প্রতিক্রিয়া এদেরকে প্রদান করে এক উষ্ণ অনুভূতি। এই পুলক অনুভূতি, স্বপ্নিল তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও নষ্ট আনন্দ এক সময় তাকে আসক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।[৪১]

এছাড়াও আমাদের দেশে শিক্ষিত সচেতন মাদকাসক্তদের এমন অনেককেই পাওয়া যায় যারা মনে করেন যে মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মস্তক স্বচ্ছ থাকে, কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, সাফল্য আসে। মাদকদ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে যুক্তিগুলোর অধিকাংশই দুর্বল মানসিকতার পরিচায়ক। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে আমাদের ছাত্র সমাজ মাদকাসক্ত। উল্লেখ্য, মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে একজন ছাত্রের যেমন একটি কারণ থাকতে পারে, তেমনি একাধিক কারণও থাকতে পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মাদকাসক্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ দায়ী। তবে তার জন্য পরিবারকে সবচেয়ে বেশী দায়ী করা যায়। পারিবারিক স্নেহ, আদর, ভালবাসা, পারিবারিক অশান্তি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থাকে এর জন্য দায়ী করা যায়।

মাদকাসক্তির প্রভাব

মাদকাসক্তি ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করে। মাদকাসক্তির ফলে কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ প্রথমেই রুদ্ধ হয়ে যায়। ছাত্র হলে সে আর লেখাপড়া করতে সক্ষম হয় না। সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন কেউ মাদক অপসংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে আত্মহননের পথই বেছে নেয়। এভাবে সমাজের

---

৪০. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৪১. *স্মরণিকা-১৯৯৩*, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃ. ৭০

www.pathagar.com

সম্ভাবনাময় একটি অংশ যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন উন্নত-অনুন্নত যে কোন দেশের জন্যই তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মাদকাসক্তির কিছু প্রভাব নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

(১) মাদকদ্রব্যের ব্যবহার শারীরিক ও মানসিক দিককে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ব্যবহারকারীকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। কিছু মাদকদ্রব্য রয়েছে যা গ্রহণ করলে উঠতি বয়সের ছেলে নিজেকে অত্যধিক শক্তিশালী অনুভব করে। আর এই 'শক্তির' সাথে বিভ্রান্তির যোগ হলে তখন ঐ তরুণ যে কোন মারাত্মক অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে। এদের কেউ কেউ এক পর্যায়ে ছিনতাই, অবৈধ চাঁদা আদায়, চুরি-খুন, মারামারি, কালোবাজারি, দেহ ব্যবসা ইত্যাদি মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধমূলক কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

(২) মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক দিককে ক্রমাবনতির দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পঙ্গু করে দেয়। সেই সাথে ব্যক্তিকে নিঃসঙ্গ ও মর্যাদাহীনের স্তরে নিয়ে আসে। মাদক নির্ভরতা ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, রোগব্যাধি সৃষ্টি করে ; ওজনহীনতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষুধামন্দায় ভোগায়। এদের কর্মোদ্দীপনা হ্রাস পায়, মতিভ্রম দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহীন ও কংকালসার হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

(৩) মদ মানুষের শরীরে বহুমুখী ক্ষতিসাধন করে থাকে। মদের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজম শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্য স্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে, সামগ্রিকভাবে শারীরিক অক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়, মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, মদ যকৃৎ কিডনী সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে, যক্ষা রোগ মদ পানেরই একটি বিশেষ পরিণতি। বর্তমানে এইডস এর প্রাদুর্ভাবেও মদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।[৪২] মাদকসেবীদের মধ্যে ৯০% বহুগামিতায় অভ্যস্ত। তবে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করতে সমকামিতা, যৌনাচার পরিহার করা অন্যতম উপায়।[৪৩] তবে HIV (Human Immune Virus) শরীরে প্রবেশ করলে তার প্রতিষেধক ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অত্যধিক সুরা পানের ফলে কিডনীর সন্নিহিত অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে বেশি প্রস্রাব উৎপন্ন করে। মাদকাসক্ত অমাদকসেবীর তুলনায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে মারা যায়। মাদকাসক্তদের মুখগহবর, গলা ও স্বরতন্ত্র (Voice Box) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুরার সাথে যারা ধূমপান করে তাদের পাকস্থলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবতী মহিলা যদি সুরা ও ধূমপান একসাথে করে তাহলে Fetal

[৪২]. *মাসিক অগ্রপথিক*, ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ-২০০৭, পৃ. ৮৭-৮৮

[৪৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

www.pathagar.com

Alcohol Syndrome দেখা দিতে পারে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে গর্ভজাত শিশু মানসিক ও শারীরিক বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেবে।[৪৪]

(৪) বিশ্বের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। যেমন:

* মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস করে দেয়, যেটা কোনভাবেই সারানো সম্ভব নয়।
* মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে দেহের ত্বকের ইলাস্টিসিটি ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
* অনেক সময় মদ্যপায়ীরা আইকেমিক হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।
* অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।
* মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে হজমশক্তি হ্রাস পায় ও খাওয়ার স্পৃহা কমে যায়।
* মাদকদ্রব্য সেবনকারী ব্যক্তি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয় যার চিকিৎসা দুরূহ।
* অতিরিক্ত মদ পান করলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্থর হয় এবং রক্তের চাপ বেড়ে যায়।[৪৫]

(৫) ক্যানাবিস জাতীয় মাদকদ্রব্যের মধ্যে গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ক্যানাবিস স্যাটাইভা নামের এক ধরনের উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফুলের ঊর্ধ্বভাগ, রস, ডাল ও বীজ থেকে এগুলো তৈরী। এর মধ্যে টেট্রাহাইডো-কেনাবিল রয়েছে যাতে তামাকের চেয়ে বার গুণ বেশি Tar এবং বিশ গুণ বেশি কার্বন-মনোক্সাইড (CO) বিদ্যমান যা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। ক্যানাবিস মানুষের চিন্তাশক্তি, শিক্ষাগ্রহণ ও স্মৃতিচারণ ব্যাহত করে। মস্তিষ্কের টিস্যুর ক্ষতিসাধন করে, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ হ্রাস করে। ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা জাতীয় ব্যাধি সৃষ্টি করে। এটা জাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কেননা, এর ব্যবহার পুরুষের টসটোসটরেন্ট এবং মহিলাদের এসট্রোজেন হরমনের উৎপাদন হ্রাস করে। ফলে মানব জাতিকে বিকৃত মস্তিষ্কের জাতিতে পরিণত করে। এ ধরনের মাদক পুরুষের শুক্রাণুর সংখ্যা কমিয়ে দেয়। কৈশোরে এ মাদক গ্রহণ করলে তা 'পিটুইটারী' গ্ল্যান্ডের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। জীবনের সূচনাতেই শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।[৪৬]

(৬) মাদকাসক্তির ফলে মানুষের বিবেকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। কারণ মাদকাসক্ত তার নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে। সুন্দর মনের অধিকারী ব্যক্তির মানসিকতা পরিবর্তিত হয়। ২ অথবা ৩ আউন্স পরিমাণ হুইস্কি পান করলে পানকারীর চিন্তা ও বিচার শক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। উদ্বেগ-অস্থিরতা হ্রাস পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হলেও তা

---

[৪৪]. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (সম্পা.), *কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী স.*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১৫৮

[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

[৪৬]. *মাসিক অগ্রপথিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিক ও স্বল্পমেয়াদী। রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা যদি ৩০% হয় তাহলে সুরা পানকারীর মানসিক বিভ্রাট ঘটবে এবং ক্রমশই চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে ; যদি রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা ৪৫% হয় তাহলে প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে ; যদি ৭০ হয় তবে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।[৪৭]

মাদকসেবীর বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার ফলশ্রুতিতে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। এমন কি সে পরিবারের অন্য সদস্যদের জান-মাল ও অর্থের নিরাপত্তা, মান-সম্মান ও বংশীয় গৌরবের ঐতিহ্য বিনষ্ট করতে একচুলও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই মাদকাসক্তি শুধু মাদকসেবীকেই ক্ষতি করে না বরং পরিবারের অন্য সদস্যদেরকেও প্রভাবিত করে।[৪৮]

(৭) মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে শিক্ষিত সমাজও রেহাই পায়নি। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রণীত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বাংলাদেশে মাদক সেবীর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ লাখ। তন্মধ্যে ১৯৯৯ সালের International Drug Control Program (IDCP) এর পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশে ৪ লাখ ৪০ হাজার শিক্ষিত মানুষ মাদক সেবন করে। এর মধ্যে ১ লাখ ৪৩ জন রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৫% ফেন্সিডিল ও হেরোইনের প্রতি, ১৩% প্যাথেড্রিন ইনজেকশনের প্রতি, ৬% হাশিশের প্রতি এবং ৩% এ্যালকোহলের প্রতি আসক্ত।[৪৯] ফলে এটা আমাদের জন্য বিরাট হুমকি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাদক সেবন করছে, যা জাতিকে পঙ্গু করে দিতে পারে।[৫০]

(৮) একথা সত্য যে, কোন মানুষ অপরাধী হয়ে জন্ম নেয় না। বরং বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে জীবনের বিশেষ সময় সে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে Teenage এ মাদকাসক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং এটাই তার অপরাধ জগতে অনুপ্রবেশের হাতে খড়ি। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে বাস, ট্রাক, রেল, বিমান ইত্যাদি যানবাহন চালনা করলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে জান-মালের অনেক ক্ষতি হয়। নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকে দুর্বল করে দেয়, যার কারণে হত্যা, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, ছিনতাই, রাহাজানি, আত্মসাৎ ইত্যাদি ঘৃণ্য অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ লাখ মানুষ নিয়মিত মাদকাসক্ত এবং আরো ৬০ লাখ মানুষ অনিয়মিত মদ পান করে। প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আমেরিকায় যে ২০ হাজার মানুষ মারা যায় তার জন্য এসব মদ্যপায়ীরাই মূলত দায়ী। আমেরিকায় বছরে ২৫ হাজার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তার পেছনেও রয়েছে

---

৪৭. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

www.pathagar.com

মদ ও মাদকের অপব্যবহার। অন্য এক তথ্য মতে বাংলাদেশের জেলখানায় আটক কয়েদিদের মধ্যে ৩৭% মাদকাসক্ত।[৫১]

(৯) মাদকদ্রব্যের অর্থনৈতিক ক্ষতি অত্যন্ত ভয়াবহ। পরিসংখ্যানবিদদের মতে একটি শহরে মদের ব্যয় সমগ্র জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান। এ বিষয়ে এক জার্মান ডাক্তার মন্তব্য করেন, "যদি অর্ধেক মদের দোকান বন্ধ করে দেয়া হয় তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। একজন মাদকসেবীর প্রতিদিন মাদক বাবদ খরচ গড়ে ১৩০ টাকা। মৃত্যু ছাড়াও মাদকের অপব্যবহারজনিত অপরাপর ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৫২] বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের বয়স ১৮-৩৫ বছর। এদের মধ্যে ৪০% বেকার, ২৫% ছাত্র, ১৫% ব্যবসায়ী এবং ২০% অন্যান্য পেশার লোক। মাদকাসক্তদের প্রতিদিনের খরচ ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা।[৫৩] মোটের উপর, মদের কুপ্রভাব সারা বিশ্বে প্রতিফলিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ফ্রান্স পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মাদক উৎপাদনকারী দেশ। পৃথিবীর বার্ষিক মদের চাহিদা হচ্ছে ৪,৫০০,০০০,০০০ গ্যালন। চাহিদার এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে ফ্রান্স। ফ্রান্সের পর জার্মানের অবস্থান। মদ রপ্তানীকারী দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকার অবস্থান আট-এ। ৯০% মদ উৎপন্ন হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইতালী, স্পেন, আলজিরিয়া, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, চিলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম মদ উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানীকারক দেশ। ১৯৮০ সালের প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে বছরে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ব্যারেল মদ উৎপাদন করে। এই উৎপাদন ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ।[৫৪]

মাদকাসক্তি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মাদকাসক্তি মানুষকে সাময়িক আনন্দ দেয় বটে তবে যতটুকু দেয় তার থেকে কেড়ে নেয় বেশি। মহান আল্লাহ বলেন, "উহাদের পাপ উপকার থেকে বেশী।"[৫৫] সর্বোপরি বলা যায়, মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী যা বিপদজনক মাইন থেকেও ভয়াবহ ও মারাত্মক। মাদকাসক্তি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার বিচ্ছেদ ঘটায় এবং বৈরীভাবের জন্ম দেয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা একে হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ

---

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৫৩. মুহাম্মদ সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৫৪. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৫৫. আল-কুরআন, ২ : ২১৯ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

www.pathagar.com

ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাঁধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না।"[৫৬]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এরপর সে তা থেকে তাওবা করেনি, সে ব্যক্তি আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।"[৫৭] তিনি আরো বলেন, "মদ পানকারী মদ পান করার সময় মু'মিন থাকে না।"[৫৮]

সুতরাং মাদকদ্রব্য মাত্রই ইসলামে হারাম। তার কারণও সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে। তা হচ্ছে এই নেশাকারী জিনিস মানুষের পরস্পরায় চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সালাত থেকেও মানুষকে বিরত রাখে। অন্যকথায়, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সাধারণভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখা সম্ভব হয় না, তেমনি স্মরণের বিশেষ অনুষ্ঠান যে সালাত, তা রীতিমত আদায় করাও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব থেকে যায়। অথচ তা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ্‌র পথে কোন বাধা বাঞ্ছনীয় নয়, এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব আড়াল উৎপাটিত করাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের কর্তব্য। কিন্তু নেশা বা মাদকদ্রব্য এ কাজে প্রধান বাধাদানকারী। অতএব এর ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় থাকতে পারে না। সর্বোপরি বহুমুখী ক্ষতির কথা চিন্তা করে ইসলামে বিশ্বাসী না হয়েও বহু রাষ্ট্র ও সরকার মদপান নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি।

ইসলামের মদ্যপান সংক্রান্ত নিষেধবাণী একদিনে অবতীর্ণ হয়নি। এটা পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিক যুগে মদের ব্যবহার এত বেশি ছিল, তা তখন আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই

---

৫৬. আল-কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

৫৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা, "ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ..., আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ৪৭৯, হাদীস নং-৫৫৭৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ

৫৮. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৭৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..

www.pathagar.com

অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এ মারাত্মক জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করতে বিজ্ঞানসম্মত ক্রমিক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা, জিনিসটিকে তখন হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল।[৫৯] এ কারণেই দেখা যায়, শুধু মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য ইসলামকে চার পর্যায়ের আয়াত নাযিল করতে হয়েছে। মক্কাতে প্রথমে যে আয়াত নাযিল হয় তা হল, "এমনিভাবে তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুরের ছড়া থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন"।[৬০]

এখানে ইঙ্গিত করেছেন, ফলের এই রসে মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে রয়েছে এ্যালকোহলে পরিণত হয়ে মাদক হওয়ার যোগ্যতা। মূলত হালাল এ বস্তু থেকে মানুষ হালাল ও উত্তম কল্যাণকর খাদ্য গ্রহণ করবে, না একে বিবেক-বুদ্ধি-স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী মদে পরিণত করবে, তা লোকদের রুচি ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এতে আরও ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, মদ পবিত্র রিযকরূপে গণ্য হতে পারে না। তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মদের প্রতি ঘৃণার বীজ মানুষের মনে বপন করাই ছিল এই প্রথমবারে অবতীর্ণ আয়াত-এর মূল উদ্দেশ্য।[৬১] অতঃপর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়, "লোকেরা তোমার নিকট মদ ও জুয়ার কথা জানতে চায়। তুমি বল, এ দু'টি কাজে বড় গুনাহ রয়েছে এবং লোকদের উপকারও আছে বটে। তবে উপকারের তুলনায় গুনাহ অধিক বড়।"[৬২]

---

[৫৯]. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. এ প্রসঙ্গে বলেন, "আল-কুরআনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা ও সূরাসমূহে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমানের উল্লেখ রয়েছে। তা গ্রহণ করে লোকেরা যখন ইসলামের দিকে ফিরে এল, তারপর হালাল-হারামের বিধান অবতীর্ণ হল। এ না হয়ে প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হত, তোমরা মদ পান কর না, তাহলে তারা অবশ্যই বলত, আমরা কখনই মদপান ত্যাগ করব না'। ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : ফাযায়িলুল কুরআন, অনুচ্ছেদ : তা'লীফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩, হাদীস নং-৪৯৯৩

يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ لِمَ قَالَ لَعَلِّي أُوَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا

[৬০]. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৭

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

[৬১]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৩

[৬২]. আল-কুরআন, ২ : ২১৯

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

www.pathagar.com

অন্য কথায়, মদ্যপানে ও জুয়া খেলায় কিছুটা ফায়দা ও উপকার যে আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কেননা, মদ ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ, জুয়া খেলায় জয়ী হলে হঠাৎ বিপুল অর্থ হাতে আসে। কিন্তু তাতে ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দিক রয়েছে। তা উপকারের তুলনায় বেশি মারাত্মক ও পরিহারযোগ্য। এ কথাটুকু বলে মূলত মদ যে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, যে জিনিস অত্যন্ত ক্ষতিকর তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য, যদিও এ মুহূর্তে তা সম্পূর্ণ হারাম করা হচ্ছে না।

এরপর সালাত আদায়ের সময়কালে মদপান করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! নেশা করে তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না। যতক্ষণ না তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে কী বলছ, তা বুঝতে পার।"[৬৩]

এ আয়াতে সালাত আদায় কালে মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কিন্তু সালাত আদায়ের সময়ের বাইরে লোকেরা মদপানে রত থাকত। কেননা অন্যান্য সময়ে মদপান করা নিষিদ্ধ হয়নি। এভাবেই চলতে থাকল। এ সময়ই সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রা. নিজের ঘরে এক ভোজনসভার আয়োজন করেন। তাতে কয়েকজন আনসারী সাহাবী যোগদান করেন। ভোজ শেষে প্রথানুযায়ী সকলে মদপানে রত হলেন। মদের মাদকতায় মত্ত হয়ে কেউ কেউ সাদ রা.-কেই আঘাত করেন। ফলে তাঁর নাকে জখম হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে মদপান চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল,

"হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা সকলে তা সম্পূর্ণ পরিহার কর, তাহলে তোমরা কল্যাণ পাবে। মনে রেখ শয়তান এ মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট এবং সে তোমাদের বিরত রাখতে ইচ্ছুক সালাত ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে। তবে কি তোমরা এ কাজ থেকে বিরত থাকবে না?"[৬৪]

এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে মদপানকারীকে মূর্তিপূজকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার কোথাও মদ্যপানকে মূর্তিপূজার সমতুল্য বলা হয়েছে। এসবই হল মদপান করার ক্ষতির দিক যা উপকারের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। যেমন:

---

৬৩. আল-কুরআন, ৪ : ৪৩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

৬৪. আল-কুরআন, ৫ : ৯০–৯১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

www.pathagar.com

* নবী করীম স. বলেন, "অভ্যাসরত মদপায়ী যদি মারা যায়, সে আল্লাহর সাথে সেই ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাৎ করবে যে ব্যক্তি মূর্তি পূজা করে"।[৬৫]
* আবূ মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মদই পান করি, আর মূর্তি পূজাই করি, এর ভেতর পার্থক্য দেখি না।"[৬৬]
* আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, মহানবী স. বলেন, "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী পানীয় নিষিদ্ধ।"[৬৭]
* তিনি আরো বলেন, "যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা উৎপাদন করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম"।[৬৮]

ইসলাম শুধু যে মদপান হারাম করেছে, তাই নয়। মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সব কিছুকেই হারাম ঘোষণা করেছে। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, তা বিক্রয়কারী ও ক্রয়কারীর উপর, তা যে উৎপাদন করায় তার উপর, তার বহনকারীর উপর এবং তা যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, তার উপর।"[৬৯]

একদা নবী করীম স. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মদ বিক্রির অর্থ দিয়ে কিছু করা যাবে কি না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ইহুদীরা তাদের গরু-ছাগলের চর্বি হারাম হওয়ার পরও তা সংগ্রহ করে বিক্রি করত। এই করে তারা আল্লাহর লানত কুড়ায়। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ মদ ও এর মূল্য হারাম করে দিয়েছেন।"[৭০]

---

[৬৫]. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ,* বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৪০৯, হাদীস নং-২৩২৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ

[৬৬]. ইমাম নাসাঈ, *সুনানুন নাসাঈ,* দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৪১০ হিজরী, হাদীস নং-৫৫৬৯

ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز و جل

[৬৭]. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৫৭ كل شراب أسكر فهو حرام

[৬৮]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ মা আসকারা কাছীরুহু ফা কলীলুহু হারাম, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১৮৪১, হাদীস নং-১৮৬৫

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام

[৬৯]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আল-আসীর লিলখামরি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১৩৯৫, হাদীস নং- ৩৬৭৪

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».

[৭০]. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭৩১০

www.pathagar.com

মদপান ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পাপ এবং ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এজন্য শরীয়ত অনুষায়ী শাস্তি দান একান্তই কর্তব্য। কিন্তু আল-কুরআনে এর কোন শাস্তি উল্লেখ নেই। হাদীসেও কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। ইহা অবস্থাভেদে সামান্য ভর্ৎসনা হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। উমর রা.-এর শাসনকালে মদপানের শাস্তি ৪০ হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত ছিল।[৭১] এ শাস্তি দিতে হলে দু'জন সাক্ষী বা স্বীয় স্বীকারোক্তি দরকার।

* ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত : মহানবী স. বলেছেন, "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে মদ পান করে এবং তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, সে পরকালে পানীয় পান করতে পারবে না"।[৭২]
* মহানবী স. বলেছেন, "দান করে খোটাদানকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"[৭৩]
* তিনি আরো বলেন, "একবার মদ পান করলে ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন না ......।"[৭৪]

---

[৭১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ : আয-যারবু বিল জারীদি ওয়ান নিআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬, হাদীস নং-৬৭৭৯

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

[৭২]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুসকিরিন খামর ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারাম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ১০৩৬, হাদীস নং-৫৬১৭

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ ».

[৭৩]. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আর-রিওয়ায়াতু ফিল মুদমিনীনা ফিল খামরি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ২৪৪৯, হাদীস নং-৫৬৭৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

[৭৪]. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৭০

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا

www.pathagar.com

মাদক ব্যবসা, উৎপাদন ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণে ইসলামী আইন

আমাদের যুব সমাজ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, এখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া জরুরী। মাদকাসক্তি আমাদের দেশে সর্বনাশা ব্যাধি হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মাদকাসক্তির ব্যাপকতার কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ দুর্যোগ। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক বৈষম্য, বাজার অর্থনীতির টানাপোড়েন, রাতারাতি অর্থবৈভবের মালিক হওয়ার নষ্ট প্রবণতার প্রভাব তারুণ্যের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। তারুণ্যের ক্ষয়কে দ্রুত থেকে দ্রুততর করার সহায়ক হিসাবে মাদক, হেরোইন, চরস, ফেনসিডিল সহ বাজারে বহু সর্বনাশা মাদকের ছড়াছড়ি। দেশের অসংখ্য মাদকাসক্ত তরুণ তরুণীকে মাদকাসক্তির অপকারিতা ও শরীয়াহর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞাত করতে হবে। এছাড়া মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলো যথেষ্ট নয়। দেশ ও সমাজকে মাদক মুক্ত করতে হলে ইসলামী আইন কাজে লাগাতে হবে। ইসলামী আইন সর্বকালের এবং সর্বশ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য ও কল্যাণকর। যারাই এই আইন প্রয়োগ করেছে তারাই এর সুফল পেয়েছে। কারণ এই আইনের উৎস স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তিনি আহবান জানিয়েছেন, "হে মুমিনগণ ! রসূলুল্লাহ যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদের প্রাণ সঞ্চার করে তখন তোমরা আল্লাহ ও তার আহ্বানে সাড়া দিবে।"[৭৫]

মাদকের ক্ষেত্রেও ইসলামী আইনের ভূমিকা অনুরূপ। যা খারাপ তা কখনও কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির জন্য অনুমোদনযোগ্য নয়, এমনকি লাইসেন্সের বলেও নয়। ইসলাম মাদককে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। মাদককে ইহকাল ও পরকালের জন্য একটি ক্ষতিকর বস্তু হিসাবে উপস্থাপন করেছে। সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে।"[৭৬]

নবী করীম স. মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হচ্ছে: মদ্যপায়ী, উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, বহনকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, মূল্য গ্রহণকারী, সেই মূল্য ভোগকারী, ক্রেতা ও যার জন্যে তা ক্রয় করা হয়। এ সকল শ্রেণীর মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ।[৭৭]

---

৭৫. আল-কুরআন, ৮ : ২৪ و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

৭৬. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৭৭. ইমাম ইবনু মাযাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : লুঈনাতিল খামরু আলা আশরাতি আওজুহিন, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ২৬৮১, হাদীস নং-৩৩৮১

www.pathagar.com

ফকীহগণের মতে মুসলিম দেশে অমুসলিমদের প্রকাশ্যে মদের ব্যবসায় অনুমতি দেয়া এবং এর সুযোগ প্রদান করা জায়েজ নয়। মিসরের মুফতী শায়খ আব্দুল মাজীদ সালীম র.-কে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী হবে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেমন- চেতনানাশক দ্রব্যাদির লেনদেন, চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা, উৎপাদন করা ইত্যাদি এবং এ ব্যবসা থেকে লব্ধ অর্থের অবস্থা কী? মুফতী আবদুল মাজীদ র. এর জবাবে বলেন, "এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, চেতনানাশক দ্রব্যাদির লেনদেন হারাম। কেননা এতে শারীরিক ক্ষতি এবং বহুবিধ ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ সকল দ্রব্য জ্ঞান লোপ করে, শরীরের ক্ষতিসাধন করে। কাজেই শরীয়ত এসব দ্রব্যেও লেনদেনের অনুমোদন দিতে পারে না। এছাড়া এগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুও হারাম। আর এ কারণেই কোন কোন হানাফী আলেম বলেন, যে ব্যক্তি ভাঙকে হালাল বলে সে ধর্মত্যাগী ও বিদআতী । চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্যও হারাম, এতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানীমূলক কাজে সহায়তা করা হয়। আর এ সহায়তা করাও হারাম। মাদকদ্রব্য তৈরীর উদ্দেশ্যে ভাঙ, আফিম ইত্যাদি উৎপাদন করাও সম্পূর্ণ হারাম আর এসব দ্রব্য থেকে লব্ধ অর্থও হারাম ও অবৈধ।"[৭৮]

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাদক সেবন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। মাদকদ্রব্য সেবন 'হারাম' এবং যে নেশাকর দ্রব্যের অধিক পরিমাণ পান করলে মাদকতা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণ পান করাও 'হারাম'। মাদকদ্রব্য গ্রহণের শাস্তি সর্বোচ্চ ৮০ বেত্রাঘাত এবং আদালত বিবেচনা করলে শাস্তির ধরন ও মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে। মাদকদ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানী-রপ্তানী, পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর শাস্তি আদালত নির্ধারণ করবে।

উপসংহার

সর্বনাশা মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্বসভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মাদকদ্রব্যের অত্যাধুনিক সংস্করণ মারিজুয়ানা, আফিম, কোকেন, এ্যালকোহল, ক্যানাবিস, মদ, ডিডোব্রিন, হেরোইন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজে কামানের ন্যায় কাজ করছে। ফলে দিনের পর দিন হত্যা ও ধর্ষণসহ নানাবিধ

عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضرب

৭৮. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ১০৪

www.pathagar.com

অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের শিকার। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের পরিণামে। মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও আসক্তদের হাতে গত কয়েক বছর আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর লুইস কার্লোস গ্যালেন। তার আগে নিহত হন আরেক বিচারপতি। আমাদের এই বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যসেবীর সংখ্যা ১৭ লক্ষাধিক। আর এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে অভিজাত মহলের লোক। ইনজেকশন জাতীয় মাদকদ্রব্যের সুবাদে অনেক কোটিপতিও প্যাথেড্রিন ইনজেকশন নিয়ে নেশা করছে। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ছিনতাই ও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ এই মাদকাসক্তি। এর ফলে যেমন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রসার ঘটছে তেমনি নৈতিক গুণাবলীও হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্য বা মাদকাসক্তি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে, তা সমাজ জীবনের গতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। ধর্মীয় মূল্যবোধই পারে কেবল এ অবস্থার হাত থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করতে। নেশামুক্ত, সুস্থ ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা আজ প্রমাণিত।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৩

ইসলামী বীমার শরঈ ভিত্তি ও বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায়

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন*

[**সারসংক্ষেপ :** *কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত বীমা কোম্পানী হলো ইসলামী বীমা। ইসলামী বীমা কোম্পানীতে সঞ্চয়ের মাধ্যমে মারা যাওয়া গ্রাহকের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের এককালীন সহযোগিতা করা সম্ভব হয়, যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কুরআন ও সুন্নাহতে বীমা সংক্রান্ত সরাসরি কোন নির্দেশনা নেই ; তবে যুগের চাহিদানুসারে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী ইজমা'-এর ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বীমা কার্যক্রম চলছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বতন্ত্র আইন রচিত না হওয়ায় বীমা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এ ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিলে ইসলামী বীমা বিশ্বব্যাপী আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।*]

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আতে মানবজাতির সকল সমস্যার সর্বোত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান পেশ করা হয়েছে। আধুনিক যে সকল বিষয়ের সরাসরি কোন সমাধান কুরআন এবং সুন্নাহতে দেয়া নেই, সে সকল বিষয়ের সমাধান কুরআন এবং সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী প্রদান করার জন্য ইসলামে ইজতিহাদের দরজা খোলা রাখা হয়েছে এবং ইজমা' ও কিয়াসকে শরী'আতের উৎস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তেমনি একটি বিষয় হল বীমা ব্যবস্থা। বিশ্ববরেণ্য আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণ কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর অর্থনীতি সংক্রান্ত মূলনীতির উপর গবেষণার পর প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী বীমা ইসলামী অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি কল্পনা করা যায় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করা আবশ্যক। আর ইসলামী অর্থনীতির দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করতে হলে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমার কল্যাণকর দিকগুলো তুলে ধরা জরুরী। তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোও প্রচলিত আইনের আলোকে শরী'আহ বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ফলে ইসলামী বীমা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বিদ্যমান এ সকল সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারলে ইসলামী বীমা অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠবে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী বীমার সংজ্ঞা, ইসলামী বীমার শরঈ ভিত্তি এবং বিদ্যমান ত্রুটি ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামী বীমার সংজ্ঞা

বীমার ইংরেজী প্রতিশব্দ Insurance; এর উৎপত্তি Insure থেকে, যার অর্থ Make sure নিশ্চিত বা নিরাপদ করা, to guarantee[১] বীমা চুক্তি, লোকসান, অসাফল্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে কোন রকম রক্ষামূলক ব্যবস্থা,[২] এক ধরনের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা,[৩] ভবিষ্যতে টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টভাবে টাকা জমা রাখা, নিশ্চয়তা বিধান করা,[৪] পারস্পরিক দায়িত্ব বণ্টন, সমবায়, সংহতি বা ঐক্য।[৫] বীমার আরবী প্রতিশব্দ تكافل যার ক্রিয়ামূল كفل-এর অর্থ : কারো জামিন হওয়া, লালন-পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।[৬] সে আলোকে تكافل এর অর্থ : লোকেরা একে অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করল, যৌথ দায় গ্রহণ করল।[৭] কুরআনুল কারীমে এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যাকারিয়া আ. তাঁর (মারইয়ামের) দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।'[৮] বীমার আরবী অপর প্রতিশব্দ التأمين, এ শব্দটি الأمن শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ আশ্বস্ত, স্বস্তি, শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা।[৯] সে আলোকে التأمين মানে বীমাকরণ, জামানত, বন্ধক, আমানত, কোন কিছু নিশ্চিতকরণ, সংশোধন, গ্যারান্টি, নিশ্চয়তা প্রদান, আশ্বাস প্রদান।[১০] কুরআনুল কারীমে এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যথা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তন্দ্রারূপ

---

১. *Samsad English-Bangali Dictionary*, Calcutta : Sahitaya Samsad August 1980, p. 569.
২. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1993, p. 404
৩. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, *ইসলামী জীবন বীমা বর্তমান প্রেক্ষিত*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৬, পৃ. ২১
৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী ও মুফতী ওলী হাসান, *বীমায়ে জিন্দেগী*, অনুবাদ : মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, ঢাকা : ইসলামী বীমা তাকাফুল প্রচলন, ২০০১, পৃ. ২৫
৫. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *ইসলামী ইনস্যুরেন্স* (তাকাফুল), ঢাকা : মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ২১
৬. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *আল-কাওসার*, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬০
৭. *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ. ১, পৃ. ৬১৭
৮. আল-কুরআন, ৩ : ৩৭ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
৯. *আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৭
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪৯৪

www.pathagar.com

শান্তি'।[১১] অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদেরও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে"।[১২] অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং ভয়ভীতির পরিবর্তে তিনি তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না"।[১৩] التعاون-এর অর্থ পরস্পর সাহায্য করা, বিপদাপদ মোকাবেলায় পরস্পর এগিয়ে আসা, পূণ্যময় কাজসমূহে পরস্পর সহযোগিতা করা। কুরআনুল কারীমে এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

পরিভাষায় বলা যায়, একটি গ্রুপ বা দলের সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করা অথবা পারস্পরিক জিম্মাদারী নেয়াকে আরবীতে تكافل বলে। একাধিক ব্যক্তি বা গোত্রের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও সাহায্য চুক্তিকেও تكافل বলা যায়। দৈব দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা মোকাবেলার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করাও تكافل ।[১৫]

মালয়েশিয়া সরকার ইসলামী বীমা ব্যবসার জন্য 'তাকাফুল আইন' ১৯৮৪ সালে প্রবর্তন করে। এতে বলা হয়েছে, "কোন কোম্পানী সমিতি বা প্রতিষ্ঠান তাকাফুল শব্দটি ইসলামী বীমা ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন ধরনের ব্যবসা করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে না"।[১৬] এ এ্যাক্টে তাকাফুলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "তাকাফুল মানে হচ্ছে এমন একটি প্রকল্প ব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক সহেযাগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্থিক সহায়তার জন্য সম্মত থাকে"।[১৭]

---

১১. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৪ أَمَنَةً نُعَاسًا

১২. আল-কুরআন, ৩৪ : ১৮ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

১৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৫৫ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

১৪. আল-কুরআন, ৫ : ২ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

১৫. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : রাবেতা পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ৫১

১৬. *তাকাফুল এ্যাক্ট মালেশিয়া*- ১৯৮৪, এস. ১

১৭. *তাকাফুল এ্যাক্ট মালেশিয়া*-১৯৮৪, প্রাগুক্ত, 'Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance which provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need where by the participants mutually agree to contribute for that purpose'.

www.pathagar.com

তাকাফুল মানে হচ্ছে একজনের প্রয়োজনে অন্যজন শরীক হওয়া। তাকাফুল স্কীমের অধীনে এর সদস্যগণ কিংবা অংশগ্রহণকারীগণ দলবদ্ধভাবে এ কথায় সম্মত হন যে, তাদের নিজেদের যে কোন নির্দিষ্ট দুর্বিপাকে বা দুর্ঘটনায় বা ক্ষতির বিপরীতে বিপদ লাঘবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া দরকার।[১৮] এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিপত্তির কারণে কোন সদস্যের যে ক্ষতি হয়, সকল সদস্যের অনুদানের ভিত্তিতে গঠিত তহবিল হতে তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিপদগ্রস্ত সদস্যকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।[১৯]

সুতরাং ইসলামী বীমা হচ্ছে একটি গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে যৌথ নিশ্চয়তার অঙ্গীকার যা দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য তার ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করেন। গ্রুপের সদস্যগণ তাদেরই কোন একজনের বিপদে সাহায্য করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক সকলে নির্দিষ্ট হারে দান করে সে ফান্ড গঠন করেন।

ইসলামী বীমার শরঈ ভিত্তি

ইসলামী বীমার উৎস চারটি। যথা : কুরআনুল কারীম, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস। তন্মধ্যে আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্ ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস। ইসলামী বীমার সপক্ষে সরাসরি কোন নির্দেশনা কুরআন ও সুন্নাহতে নেই ; তবে কুরআনুল কারীম এবং রাসূলে আকরাম স.-এর সুন্নাহর যে সব বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

প্রথম উৎস : আল-কুরআন কারীম

কুরআনুল কারীমের প্রায় ৫০০ আয়াতে শরী'আহ সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। শরী'আহ সংক্রান্ত এ আয়াতগুলোতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। কোন কোন বিষয়ের সমাধান সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন বিষয়ের সমাধান দেয়া হয়েছে ইংগিতমূলকভাবে। তেমনি একটি বিষয় ইসলামী বীমা। ইসলামী বীমার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিপদ মোকাবেলার জন্য সঞ্চয়, বিপদে পতিত হলে যথা গ্রাহকের মৃত্যুতে ইয়াতীম সন্তানাদি ও বিধবা মা-বোনদের এককালীন সহযোগিতা প্রদান, বীমার মেয়াদান্তে লাভসহ মূলধন ফেরত দেয়া হয়। কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে ইসলামী বীমার এ বিষয়গুলোর বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. কর্মস্থলে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয করে দিয়েছেন। এ নামায আদায়ের পর উপার্জনের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ

---

[১৮]. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, *ইসলামী জীবন বীমা বর্তমান প্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

[১৯]. ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[২০]

খ. ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার জন্য সঞ্চয় করা

দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য সম্পদের প্রয়োজন। আবার আকস্মিক বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখে কেউ পতিত হলে তা হতে উদ্ধারের জন্য গচ্ছিত সম্পদের প্রয়োজন। তাই ভবিষ্যত দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বর্তমান সঞ্চয় হতে একটি অংশ খরচ না করে জমা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মিসরের রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সবাই অপারগ হলে রাজা ইউসুফ আ.-এর নিকট ব্যাখ্যা চান। ইউসুফ আ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও করণীয় জানিয়ে দেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক, আপনি আমাদের এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ করুন; যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করতে পারি। ইউসুফ আ. বললেন, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে। অতঃপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর, তোমরা এ দিনের জন্য যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে"।[২১]

গ. যে কোন ধরনের কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা

কল্যাণকর ও তাকওয়াপূর্ণ কাজে সহযোগিতা করা এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের এ নির্দেশটি আম (ব্যাপক)। তাই পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে কোন ক্ষেত্রে এ নির্দেশ প্রযোজ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সৎকর্ম ও তাকওয়াপূর্ণ কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা"।[২২]

---

[২০]. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[২১]. আল-কুরআন, ১২ : ৪৬-৪৮

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ

[২২]. আল-কুরআন, ৫ : ২

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

www.pathagar.com

ঘ. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে নিহতের পরিবারকে দিয়াত প্রদান

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে নিহতের পরিবারকে دية বা রক্তমূল্য প্রদান করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনা যেহেতু কোনভাবেই সম্ভব নয়; সেহেতু অন্তত রক্তমূল্য পরিশোধ করলে এ বিপদের মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি নিজ পায়ে দাঁড়ানোর একটি অবলম্বন খুঁজে পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কোন মুসলমানের উচিৎ নয় অপর মুসলমানকে হত্যা করা; কিন্তু ভুলক্রমে হলে তা ভিন্ন কথা। যে মুসলমান ব্যক্তি অপর মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস আজাদ করবে এবং তার স্বজনদের রক্তমূল্য প্রদান করবে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় তা ভিন্ন কথা। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে"।[২৩]

ঙ. উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব অবস্থায় রেখে না যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দান

অসহায় দুর্বল ও নিঃস্ব অবস্থায় উত্তরাধিকারীদের না রেখে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। কারণ দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে নামাযে দাঁড়ালে নামাযের প্রতি মনোযোগে বিঘ্নঘটে। আবার ক্ষুধার নিদারুণ কষ্ট হতে বাঁচার জন্য মানুষ অনেক সময় অসৎ পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের ভয় করা উচিৎ যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশংকা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে"।[২৪]

চ. অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্বদের সাহায্য প্রদান

ঈমান আনার পর নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা যেমন ইসলামী শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ইবাদাত, তেমনি মৌলিক ইবাদাত হল, আত্মীয়স্বজন ইয়াতীম- মিসকীন ও সাহায্যপ্রার্থীদের সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে

---

২৩. আল-কুরআন, ৪ : ৯২

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً

২৪. আল-কুরআন, ৪ : ৯ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا

ইবাদত করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম- মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য"।[২৫]

দ্বিতীয় উৎস : হাদীসে রাসূল স.

কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত আয়াতের পাশাপাশি রাসূলে আকরাম স. অসংখ্য হাদীসে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়, বিপন্ন মানতার কল্যাণে এগিয়ে আসা, ইয়াতীম ও বিধবাদের পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রাসূলে আকরাম স.-এর হাদীসও ইসলামী বীমার শর'ঈ উৎস হিসেবে ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল:

ক. উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব করে রেখে যাওয়া অনুচিৎ

কোন পিতা-মাতার জন্যই উচিৎ নয় তার সন্তানদের নিঃস্ব করে রেখে যাওয়া। কারণ সন্তানদের নিঃস্ব করে রেখে গেলে তারা অন্যের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের উচিৎ সৎভাবে উপার্জন করে উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু সম্পদ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা। রাসূলে আকরাম স. বলেন, "তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপরের উপর নির্ভরশীল করার চেয়ে স্বচ্ছল, ধনী করে রেখে যাওয়া উত্তম এবং তুমি যা কিছু খরচ করবে, তা সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে তুমি যে লোকমা তুলে দাও তাও সাদাকার অন্তর্ভুক্ত"।[২৬]

---

[২৫]. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

[২৬]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আল-ওয়াসাইয়া, অনুচ্ছেদ : আই-ইয়াতরুকা ওয়ারাছাতাহু আগনিয়াআ খাইরুন মিন আই ইতাকাফফাফুন নাছা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ২২০, হাদীস নং -২৭৪২

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

www.pathagar.com

খ. মুমিনদের বিপদাপদে সাহায্য করার নির্দেশ

কোন মুসলমান বিপদে পতিত হলে তাকে সাহায্য করা এবং তার বিপদ লাঘবে চেষ্টা করার জন্য অপর মুসলমান ভাইদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদ লাঘবে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদের সময় সে ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন। রাসূলে আকরাম স. বলেন, "মুমিনরা পরস্পর ভাই। সে তার অন্য কোন মুমিন ভাইয়ের উপর যুল্ম করে না এবং অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুমিন ভাইয়ের বিপদ দূর করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন"।[২৭]

সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের ময়দানে চরম অর্থনৈতিক সংকটে থেকেও অপর মুসলমান ভাইয়ের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আশ'আরী সম্প্রদায়ের লোকেরা যুদ্ধাভিযানে যখন তাদের খাবার নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা মাদীনায় তাদের পরিবারের খাদ্যের পরিমাণ কমে যায় তখন তাদের নিকট যার যা আছে তা একটি কাপড়ে একত্রিত করেন। অতঃপর একটি পাত্রে করে পরস্পর সমানভাবে বণ্টন করে নেয়। অতএব তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত"।[২৮] উক্ত হাদীসে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার বাস্তব উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যে, তারা বিপদের মুহূর্তে তাদের প্রত্যেকের নিকট কম-বেশী যা ছিল তা তারা একত্রিত করেছিলেন। অথচ তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিল যার কিছুই ছিল না। পুনর্বণ্টনে তারা সকলে সমান অংশ লাভ করেন। ঈমানদাররা পরস্পর একটি দেহের ন্যায়। দেহের এক অঙ্গ ব্যথিত হলে যেমন সারা দেহ সে ব্যথায় ব্যথিত হয়, তেমনি যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিপদে পড়লে সকলের কর্তব্য সে বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স.

---

২৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আল-মাযালিম, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াযলিমুল মুসলিমুল মুসলিম ওয়া লা ইউসলিমুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২, হাদীস নং-২৪৪২

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* অধ্যায় : আশ-শারিকাত, অনুচ্ছেদ : আশ-শারিকাতু ফিত ত'আম ওয়ান নাহদি ওয়াল উরূয...., পৃ. ১৯৬, হাদীস নং-২৪৮৬

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

www.pathagar.com

বলেন, "পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-অনুগ্রহ এবং মায়া-মমতার দিক থেকে মু'মিনগণ একটি দেহ সদৃশ। যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন গোটা দেহই এর ফলে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়"।[২৯]

তাই প্রতিটি ঈমানদারের উচিত অপর ঈমানদার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার কোনো বিপদ দূর করলো, আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামাত দিবসের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তিকে কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির দুর্দশা হালকা করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা হালকা করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আলাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ্ ততক্ষণ তাঁর বান্দাহর সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে।"[৩০]

গ. ইয়াতীমের পুনর্বাসনে উৎসাহ প্রদান

ইয়াতীমের পুনর্বাসনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যারা ইয়াতীমের পুনর্বাসনে চেষ্টা করবে, ইয়াতীমের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টা করবে, তাদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা বাড়িয়ে দিবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম স. বলেন, "আমি এবং ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এরূপ অবস্থায় থাকবো- একথা বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আংগুল একত্রিত করে ইংগিত প্রদান করেন"।[৩১] ইসলামী বীমার মাধ্যমে মারা যাওয়া গ্রাহকের ইয়াতীম সন্তানদের যে মৃত্যুদাবী পরিশোধ করা হয়, তা তাদের পুনর্বাসনে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে।

---

[২৯]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : রহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮, পৃ. ৫০৯, হাদীস নং-৬০১১

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

[৩০]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন ওয়া আলায যিকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪৭, হাদীস নং-৬৮৫৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ ».

[৩১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : আল-লিআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮, হাদীস নং-৫৩০৪

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

www.pathagar.com

ঘ. বিধবা মহিলাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ

আমাদের সমাজে বিধবা মা ও বোনেরা চরমভাবে নিগৃহীত হন। তাদের পুনর্বাসনে ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। বিধবা মা-বোনদের পুনর্বাসনে যারা চেষ্টা করে তারা মুজাহিদের ন্যায় মর্যাদাবান বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম স. বলেন, "বিধবা ও মিসকীনদের পুনর্বাসনের জন্য যারা চেষ্টা করে, তারা দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের ময়দানে চেষ্টা সাধনা করার ন্যায় কিংবা সারারাত্রি ইবাদতকারী এবং সারাদিন রোযা পালনকারীর ন্যায় মর্যাদাবান"।[৩২] বীমা ব্যবসা পরোক্ষভাবে বিধবা মহিলাদের পুনর্বাসনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। কারণ কোন ব্যক্তি বীমা করার পর মারা গেলে যে মৃত্যুদাবী পরিশোধ করা হয়, তা সে ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে সাবলম্বী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঙ. সম্পদের একটি অংশ উত্তরাধীকারীদের জন্য রাখার নির্দেশ

কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ ইসলামের পথে উৎসর্গ করতে চাইলে সমুদয় সম্পদ দান না করে একটি অংশ তার নিজের এবং পরিবার পরিজনের জন্য রেখে দেয়া কর্তব্য। এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, "কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার তওবার পূর্ণতা এভাবে সাধন করতে চাই যে, সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আমার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর নামে সাদাকা করে দিব। রাসূল স.-এর উত্তরে বলেন, কিছু সম্পদ অবশ্যই তোমার মালিকানায় থাকা দরকার। এর মাঝেই তোমার কল্যাণ এবং ফায়দা নিহিত রয়েছে"।[৩৩]

তৃতীয় উৎস : ইজমা ও কিয়াস

বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের পাশাপাশি অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যে বীমা ব্যবস্থা চালু রয়েছে রাসূলে আকরাম স.-এর আমলে সে রকম কোন বীমা ব্যবস্থা ছিল না। তবে বিপদে পতিত ব্যক্তিকে কিংবা তার পরিবারবর্গকে সাহায্য করার প্রচলন রাসূলুল্লাহ স. চালু করেন যা আধুনিক বীমা ব্যবস্থার অনুরূপ। আর এরূপ ব্যবস্থা এর

---

৩২. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল আহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২, হাদীস নং-৫৩৫৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

৩৩. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদ : সূরাতুত তাওবাহ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬৫, হাদীস নং-৩১০২

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قلت يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك

www.pathagar.com

আগে থেকেই প্রচলিত ছিল।[৩৪] শরী'আহর মূলনীতিমালার সাথে প্রচলিত প্রথাসমূহ সাংঘর্ষিক না হলে তা ইসলামে গ্রহণযোগ্য। তাই প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার অনুরূপ প্রাচীন প্রথাসমূহ রাসূলুল্লাহ স. অনুমোদন দিয়েছেন।

প্রথমত : গোত্রীয় প্রথা হিসেবে 'আকিলা মতবাদ থেকে বীমা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে যা প্রাচীন আরবের সামাজিক ও গোত্রীয় ঐতিহ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোন গোত্রের কোন সদস্য ভিন্ন গোত্রের সদস্যের হাতে নিহত হলে হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহতের উত্তরাধিকারীকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হতো।[৩৫] যারা হত্যাকারীর পক্ষ হতে রক্তমূল্য পরিশোধ করতো তাদের বলা হতো আকিলা।

আকিলা পদ্ধতির আধুনিক রূপ হচ্ছে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা। ভুলক্রমে হত্যার কারণে যে دية বা রক্তমূল্য হত্যাকারীর পক্ষ হতে নিহতের পরিবারের সদস্যদের দেয়া হয় তার সমর্থন কুরআনুল কারীমেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে দণ্ডস্বরূপ তাকে একজন মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট দিয়াত পৌঁছাতে হবে"।[৩৬] دية বলতে রক্তমূল্য বোঝানো হয়েছে। এ دية আদায়ের দায়িত্ব আরব সমাজের প্রাচীন প্রথানুসারে আকিলা তথা হত্যাকারীর নিজ গোত্রের পুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইসলাম এ প্রথাকে অনুমোদন দেয়ায় دية আদায়ের দায়িত্ব আকিলার উপর অর্পিত হয়।[৩৭]

دية দেয়ার দায়িত্ব আকিলার উপর ন্যস্ত করায় স্বাভাবিকভাবে মনে হয় একজনের অপরাধের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো হচ্ছে। অথচ কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক মানুষ যা-ই উপার্জন করবে, তা তারই উপর বর্তাবে এবং কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না"।[৩৮]

প্রকৃত পক্ষে আকিলার উপর دية দেয়ার দায়িত্ব পারস্পরিক সহানুভূতি এবং একের দুঃখ ও বিপদ সকলে ভাগ করে নেয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে অর্পিত হয়েছে। একজনের কৃত অপরাধে অন্যদের দায়ী করার জন্য নয়। কারণ দিয়াত দেয়ার মূল

---

৩৪. ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৩৫. মাওঃ মোঃ আলাউদ্দীন খান, *পারিবারিক তাকাফুলের ক্রমবিকাশ* (প্রবন্ধ), জাতীয় সেমিনার-২০০৪, স্মরণিকা প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুঃ, পৃ. ৩৭

৩৬. আল-কুরআন, ৪ : ৯২ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃঃ ৯৪

৩৮. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৫ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

www.pathagar.com

দায়িত্ব হত্যাকারীর উপরই বর্তাবে। তবে আত্মীয়তার যে হক পরস্পরের প্রতি রয়েছে دية আদায়ের মাধ্যমে তা আরো সুদৃঢ় হয়।

دية দেয়ার দায়িত্ব যে আকিলার তার কারণ হিসেবে বলা যায়, এ জরিমানা যদি হত্যাকারী নিজ থেকেই আদায় করতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে সে দরিদ্র্যতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তা হলে সে পরিবারে চরম বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হবে। কেননা এক ব্যক্তির দারিদ্র্য আশংকা গোষ্ঠীবদ্ধ সমস্ত লোকের দারিদ্র্য আশংকার তুলনায় অনেক বেশী।[৩৯]

রাসূলে আকরাম স.-এর আমলে বীমা ব্যবস্থার উন্নয়নে দু'টি নজির পাওয়া যায়। প্রথমত : প্রাচীন আরবের আকিলা প্রথাকে রাসূলে আকরাম স. গ্রহণ করে নিহতের পরিবারকে دية প্রদানের দায়িত্ব হত্যাকারীর গোত্রের পুরুষ সদস্যদের উপর ন্যস্ত করেন।[৪০] রাসূলুল্লাহ স.-এর বেশ কিছু হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হুযায়ল গোত্রের দু'মহিলার ঝগড়ার সময় একজনের পাথরের আঘাতে অপর মহিলা ও তার গর্ভের শিশুটি নিহত হয়। নিহতের উত্তরাধিকারীরা রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। রাসূলুল্লাহ স. রায় দিলেন, "গর্ভস্থ শিশুর জন্য একটি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী এবং নিহত মহিলার রক্তমূল্য হত্যাকারীর আকিলাকে প্রদান করতে হবে"।[৪১]

দ্বিতীয়ত : ৬২২ সালে রাসূলে আকরাম স. মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। সে সময় মদীনায় মুহাজির, আনসার, ইহুদী ও খ্রিষ্টান এ চার শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। রাসূলে আকরাম স. সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার প্রদান করে একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধানের ৩টি ধারায় এক ধরনের সামাজিক বীমা প্রবর্তন করা হয়েছিল,[৪২] যা নিম্নরূপ :

দিয়াতের অনুশীলনের মাধ্যমে : دية বা রক্তমূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের উপর না রেখে চুক্তিবদ্ধ সকল গোত্র আকিলা প্রথা অনুসারে যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে রক্তমূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করেন।[৪৩]

---

৩৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৪০. ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামী বীমার ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪১. *ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী*, ৩য় খণ্ড, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস নং- ৬৯১০, পৃ. ৩৩৪

أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

৪২. ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামী বীমার ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

৪৩. ডা. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *মহানবীর জীবন চরিত*, মাওঃ আব্দুল আওয়াল অনুদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৩

www.pathagar.com

মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে : বন্দীদের মুক্ত করার জন্য সংবিধানে একটি ধারা প্রণয়ন করা হয়। এতে বলা হয়, যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে কেউ বন্দী হলে, বন্দীর আকিলা তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করবে।[৪৪] এ ধরনের চাঁদাকে এক ধরনের সামাজিক বীমা হিসেবে অভিহিত করা যায়। সনদের চুক্তিতে বলা হয়, "কুরাইশ মুহাজিররা দায়ী থাকবে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য, যাতে কল্যাণকর ও ন্যায় বিচারের নীতি অনুসারে ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়"।[৪৫]

এছাড়া বিধানটি সে সময় মদীনায় বসবাসরত বনূ 'আউফ, বনু হারিস, বনু নাজ্জার, বনূ জুসাম এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও প্রযোজ্য হয়। এ সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, অভাবী, অসুস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য সমাজ পারস্পরিক সমঝোতামূলক একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।[৪৬]

কুরআনুল কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলে আকরাম স.-এর বাণীসমূহের আলোকে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী চিন্তাবিদদের মাঝে ইসলামী বীমা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এ সময় বেশ কিছু কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণ বক্তৃতা বিবৃতির পাশাপাশি ইসলামী বীমার উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। বীমার বৈধতার বিষয়ে ১৯৮৫ সালে ২২-২৮ ডিসেম্বর ও.আই.সি-এর মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী শীর্ষক সেমিনার জিদ্দায় অনুষ্ঠিত হয়। সে সেমিনারে ইসলামী বীমা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪৭]

১. বাণিজ্যিক বীমা, যেগুলোতে কোম্পানী একই পরিমাণের প্রিমিয়াম বহাল রাখার মাধ্যমে লেনদেন করে, তাতে চুক্তি অবৈধ হবার বড় কারণ غرر বা ধোকা যেগুলো শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম।

২. বিকল্প চুক্তি, যাতে ইসলামী লেনদেনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। তাহলো অনুদান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতামূলক বীমা চুক্তি। আর এরূপ চুক্তি বৈধ।

---

[৪৪]. ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দীন, *ইসলামী বীমার ধারণা ও কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৪৫]. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, অধ্যায়- আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদঃ আল-'আকিলাহ, খ. ৮, পৃ. ১০৬, হাদীস নং-১৬১৪৭

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

[৪৬]. ড. আলী মুহাম্মদ আসসালাবী, *আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*, কায়রো : মুআস্সিসাতুন ইক'রা'; ২০০৫, খ. ১, পৃ. ৩২৬

[৪৭]. ড. আলী আহমদ আস-সালূস, *মাওসূ'আতুল কাযায়া*, কাতার : দারুছ ছাকাফাহ, ২০০৮, খ. ১৯, পৃ. ৩৯৫

www.pathagar.com

৩. ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বীমা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান করতে হবে। তেমনিভাবে সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বীমা পদ্ধতি সংস্কার ও নবায়ন করার জন্য দাওয়াত দিতে হবে, যাতে করে ইসলামী অর্থনীতি স্বাধীনভাবে কার্যক্রম চালাতে পারে এবং পুঁজিবাদ হতে মুক্ত হতে পারে।

বীমার বৈধতার বিষয়ে মক্কাতে ১৩৯৮ হিজরীর ১০ শাবান এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্ববরেণ্য আলিম শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায, শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ, শায়খ আব্দুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[৪৮]

সম্মেলনে তাঁরা যৌথভাবে যে রায় প্রদান করেন সে সম্পর্কে শায়খ জারকা বলেন, "আল-মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী সর্ব সম্মতিক্রমে বড় বড় আলিমগণ সংস্থার সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য হয়েছে যে, ব্যবসায়িক তামীনের পরিবর্তে পারস্পরিক সাহায্যের তামীন বৈধ"।[৪৯]

১২৮৫ হিজরী মুহররাম মাসে মিসর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স আল-মাজমাউল বুহুছিল ইসলামিয়্যাতে সহযোগিতাভিত্তিক বীমার বৈধতা ঘোষণা করে বলা হয়েছে, "যে বীমা কোন সংগঠন তার সদস্যদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তা শরী'আহ সম্মত। আর এ ধরনের পদক্ষেপ কল্যাণের পথে সহযোগিতা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে"।[৫০]

ইসলামী বীমার পক্ষে উলামায়ে কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামী বীমার পক্ষে তাদের জোরালো মতামত তুলে ধরেন। যথা: মুফতী মুহাম্মাদ শফী' র. বলেন, "ইসলামী বীমার কার্যক্রম হলো, কতিপয় এককের মাঝে পরস্পর সহযোগিতার কার্যক্রম। এতে পলিসি ক্রেতা স্বেচ্ছায় বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে। কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যে উপার্জিত লভ্যাংশের অধিক বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চুতর্থাংশ ওয়াক্‌ফ করবে, যা দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য শরী'আতের মূলনীতির ভিত্তি অনুযায়ী ব্যয় করা হবে"।[৫১]

---

[৪৮]. মাওলানা আখতার ইমাম, *আদল ইন্সুরেন্স এক তাহকীকী যায়েযাই* জাদীদ ফিকহী মাবাহিছ, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ৩৭৩

[৪৯]. মোস্তফা আহমাদ জারকা, উকৃদুত- *তা'মিন ওয়া মাওয়াকিফু 'আলাশ-শারী'আতি মিনহু*, দিমাশক : ১৯৬২, পৃ. ১০৬

قرر المجمع الفقهى بالإجمع الموافقة على قرار هيئة كبار العلماء يجواز التعاونى بدلا من التأمين التجارى

[৫০]. ড. মুহাম্মদ বালতাজী, উকৃদুত-*তা'মীন*, কায়রো : দারুস সালাম, তা.বি., পৃ. ১০

[৫১]. মাওলানা আখতার ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯১-৪৯২

www.pathagar.com

ইউসূফ আল-কারযাভী বলেন, "ইসলামী বীমা কোম্পানীতে ইসলাম অনুকূল নিয়ম-নীতি অবলম্বন গ্রহণযোগ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জীবন-বিধান মুসলিম জনগণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী লোকদের জন্যে সামষ্টিক ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা বা সরকারী অর্থ ভাণ্ডার তথা বায়তুল-মালের সাহায্যে বীমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। ইসলামের বায়তুলমাল প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্যে বীমা কোম্পানীই বটে। যারাই তার অধীনে বসবাস করবে তাদের সকলের জন্যেই তা কাজে আসবে। দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদকালে ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতা করার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে সরকারী দায়িত্বশীলের কাছে নিজের সমস্যা পেশ করতে পারে। সরকার সে অনুযায়ী তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মৃত্যুর পর অসহায় উত্তরাধিকারীদের জন্যেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে"।[৫২]

বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ওসামানী বলেন, "প্রচলিত বীমার বিকল্প হিসেবে পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে অংশীদারগণ স্ব-স্ব ইচ্ছানুযায়ী ফান্ডে টাকা জমা করেন। সারা বছরে যাদের দুর্ঘটনা ঘটে এ ফান্ড থেকে তাদের সাহায্য করা হয়। বছর শেষে টাকা বেঁচে গেলে অংশীদারগণ যোগানের ভিত্তিতে টাকা ফেরৎ নেবে অথবা আগামী সালের ফান্ডের জন্য চাঁদা হিসেবে রেখে দেবে। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের ইসলামী বীমা (তাকাফুল) কোম্পানী চালু হয়েছে যা বৈধ"।[৫৩]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম রহ. বলেন, "ইসলামের সূচনায় ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে রাসূলে আকরাম স. আকিলার বিধান কার্যকরভাবে চালু করে আধুনিক বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্য কথায় বলা যায়, রাসূলে আকরাম স.-এর রোপিত বীজের সেই অংকুরই আজকের দিনের বীমা এক বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হল বলে মনে করা যায় না"।[৫৪]

ইসলামী বীমার বিদ্যমান ত্রুটি

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে ইসলামী বীমার কার্যক্রম বিস্তৃত হচ্ছে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও ইসলামী বীমা ব্যাপক জনপ্রিয়তা

---

[৫২]. আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৩৭৯-৩৮০

[৫৩]. বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তাকি ওসমানী, *ইসলাম আওর জাদীদ মা'শিয়াত ওয়া তিজারাত*, অনুবাদ : আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, *ইসলামী ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা*, ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৪৯

[৫৪]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

www.pathagar.com

অর্জন করছে। তবে ইসলামী বীমায় উল্লেখযোগ্য কিছু ত্রুটি রয়েছে। বিদ্যমান এ ত্রুটিসমূহ দূর করা হলে সর্বশ্রেণীর মাঝে তা আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠবে। নিম্নে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করা হলো :

ইসলামী বীমার পূর্বশর্ত হচ্ছে, তা গারার (غرر) মুক্ত হতে হবে। গারার একটি আরবী পরিভাষা। অনিশ্চিত বিষয়কে গারার বলা হয়। যে সকল লেনদেনে অনিশ্চিত উপাদান থাকে সে সমস্ত লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতারিত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ অর্থে গারার বলতে বুঝায় যার চেহারা সুন্দর, দেখতে ভাল কিন্তু ভেতরে নোংরা বা ঘৃণা করার মত কিছু রয়েছে। সুন্দর কথা বলে বা সুন্দর চুক্তির মাধ্যমে অন্যকে ঠকানোই হচ্ছে গারার। ব্যবসায়িক প্রতারণা এবং জালিয়াতি গারার-এর আওতায় পড়ে। যে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না সে বিষয়ে গারার রয়েছে। যেমন : পানিতে মাছ কিংবা আকাশে পাখি। যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে তবে বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ ভালভাবে জানা নেই সে জিনিসে গারার আছে। যেমন : যখন বিক্রেতা কোন জিনিস প্যাকেট না খুলে বিক্রি করে। এভাবে গারার এবং অজ্ঞতা কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণভাবে থাকে আর কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে থাকে।[৫৫] এ কারণে গারার নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়, যেমন:

১. হানাফী মাযহাব মতে যার ফলাফল গোপন তা-ই গারার।
২. শাফিঈ মাযহাব মতে-যার প্রকৃতি এবং ফলাফল উভয় গোপন তা-ই গারার।
৩. হাম্বলী মাযহাব মতে-গারার হচ্ছে যার ফলাফল অজানা এবং যার অস্তিত্ব আছে কি নেই বলা মুশকিল, তাই তা সরবরাহের অযোগ্য।
৪. ইবনে হাযাম র.-এর মতে- গারার হচ্ছে তা যা একজন ক্রেতা নিশ্চিতভাবে না জেনে ক্রয় করে এবং একজন বিক্রেতাও অনিশ্চিতভাবে না জেনে বিক্রি করে।
৫. অন্যান্য আলিমের মতে, গারার বিক্রয় চুক্তি হলো এমন একটি ব্যাপার যেখানে ঝুঁকি আছে এবং সে ঝুঁকি চুক্তির এক বা একাধিক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সম্পদের লোকসান ঘটায়।
৬. প্রফেসর মুস্তফা আল যারকা আরও সুন্দর করে বলেছেন, "গারার হচ্ছে সম্ভাব্য বস্তুর বিক্রয়, যার অস্তিত্ব এবং গুণাবলী নিশ্চিতভাবে জানা নেই। কারণ সেখানে এমন ঝুঁকি বিদ্যমান যা ব্যবসাকে জুয়া খেলার সাথে শামিল করে তোলে"। প্রফেসর যারকার সংজ্ঞাটি গারার-এর ব্যাপারে আমাদের ধারণাকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে।[৫৬]

---

[৫৫]. ড. আ. ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
[৫৬]. *প্রাগুক্ত*

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ স. পাথর নিক্ষেপ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় এবং প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫৭] অপর একটি হাদীসে জন্তুর গর্ভের অন্তর্নিহিত ভ্রূণ ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. জন্তুর গর্ভের অন্তর্নিহিত ভ্রূণ ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। এটি এমন একটি ক্রয় পদ্ধতি, যা জাহিলী যুগের লোকেরা করত। তা ছিল এরূপ, তারা উট ক্রয় করত এভাবে যে, উটের গর্ভস্থিত বাচ্চা প্রসবের পর সেই বাচ্চা গর্ভবতী হয়ে তার পেট হতে যে বাচ্চা হবে সেটি তারা দুস্তর পূর্বেই ক্রয় করত"।[৫৮]

ইসলামী বীমা গারার মুক্ত বলা হলেও বাস্তবে বীমার চুক্তির বিভিন্ন অংশ গ্রাহকের নিকট অস্পষ্ট, যা গারার এর পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামী বীমা কোম্পানীর দলীলপত্রে গ্রাহকের জমাকৃত টাকা দু'টি ফান্ডে জমা হবার ঘোষণা রয়েছে। তন্মধ্যে ৫% তাবাররু' (تبرع) বা কল্যাণ ফান্ডে এবং ৯৫% মুদারাবা বা বাণিজ্যিক ফান্ডে। সে হিসেব অনুযায়ী দশ বছরে গ্রাহক এক লক্ষ টাকা বীমাংকের বিপরীতে মেয়াদী পলিসিতে কমপক্ষে জমা দেয় ১,১২০০০/- শিশু নিরাপত্তা বীমায় জমা দেয় ১,১৭,০০০/- হজ্জ বীমায় জমা দেয় ১,১৮,০০০/-;[৫৯] কিন্তু ম্যাচুরিটি বোনাসের সময় কোম্পানী ১,০০,০০০/- টাকা বীমা অংক ও লভ্যাংশ গ্রাহককে ফেরত দেয়। বীমাংকের অতিরিক্ত সমুদয় কিস্তি বীমাচুক্তির শর্তানুসারে তাবাররু (تبرع) ফান্ডে জমা হয় না, ম্যাচুরিটি বোনাসের হার অনুযায়ী মুদারাবা ফান্ডেও জমা হয় না, তাহলে এ অর্থ কোন ফান্ডে জমা হয়? এ অর্থের বৈধ মালিকানা কার? বীমা দলীল কিংবা অন্য কোন কাগজপত্রে এ সংক্রান্ত কোন বক্তব্য নেই। নিশ্চিতরূপেই বলা যায় এটি গারার এর পর্যায়ে পড়ে।

পেনশন ও শিশু নিরাপত্তা বীমায় দু'বছর কিস্তি দেয়ার পর সমর্পণের আবেদন করলে মাত্র ২৫% মূলধন ফেরত দেয়া হয় এবং পাঁচ/ছয় বছর নিয়মিত চালানোর পর আবেদন করলে ৩০% মূলধন গ্রাহক ফেরত পান। সার্ভিস চার্জ এবং তাবাররু' ফান্ডের ব্যয় বাদ দিয়ে গ্রাহক আরো বেশী মূলধন ফেরত পাবার কথা। বীমা দলীলে

---

[৫৭]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : বুতলানু বাইঈল হাসাতি ওয়াল বাইঈল লাযী ফীহি গারার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৯, হাদীস নং-৩৮০৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

[৫৮]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : বাইউল গারারি ওয়া হাবলুল হাবলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং-২১৪৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

[৫৯]. ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, *পরিকল্প পরিচিতি ও প্রিমিয়াম তালিকা*, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রিন্টিং প্রেস, ২০১১, পৃ. ১৬-৩০

www.pathagar.com

কিংবা অন্য কোন কাগজপত্রে সমর্পণ ভ্যালু এতো কম হওয়ার কোন কারণ উল্লেখ নেই এবং মাঠ পর্যায়ের বড় বড় কর্মকর্তারাও কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন না। এটি নিঃসন্দেহে যুলম এর পর্যায়ে পড়ে এবং সমর্পণ ভ্যালু কম হওয়ার কোন কারণ দলীলে উল্লেখ না থাকায় তা গারার এর পর্যায়ে পড়ে।

গ্রাহক পলিসি করার পর দুই/তিন বছরের মাথায় সমর্পণ করলে মূলধন ৭০% ফেরত পায়। কমিশন, তাবাররু' ফান্ড এবং অফিসিয়াল ব্যয় বাবদ অবশিষ্ট ৩০% অর্থ কর্তন করা হয়। অনুরূপভাবে এক বছরের মাথায় মূলধন ফেরত চাইলে কিছু কিছু ইসলামী বীমা কোম্পানী ৩০% মূলধন ফেরত দেয় আর কিছু কিছু কোম্পানী কোন অংশই ফেরত না দিয়ে বীমা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। যার ফলে নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য এ সময় কর্মী/এজেন্ট কমিশন হিসেবে পাওয়া অর্থ ফেরত দিয়ে দেয়। অথচ পারিশ্রমিক বাবদ এ অর্থ বীমা কোম্পানী হতে কর্মী পেয়েছিল। কর্মীদের উপর এটি এক ধরনের যুলম।

ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো দশ বছর পূর্তিতে গ্রাহকদের ম্যাচুরিটি চেক প্রদান করা শুরু করেছে। এতে দেখা যায় যে, ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বীমাংকের পরিবর্তে সকল পরিকল্পে গ্রাহকের ম্যাচুরিটি হার সমান। অথচ পরিকল্পভেদে এক লক্ষ টাকা বীমাতে বার হাজার থেকে আঠার হাজার টাকা পর্যন্ত বেশী জমা হয়। টাকা জমার হার অনুযায়ী ম্যাচুরিটি হার নির্ধারিত হওয়া আদল ও ইনসাফের দাবী। অথচ যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়াই সমহারে প্রফিট দেয়া হচ্ছে। কারণ তাবাররু' ফান্ড বাদ দিলে অবশিষ্ট টাকা যেহেতু বীমা দলীল অনুযায়ী মুদারাবা তহবিলে জমা হয় সেহেতু এ ফান্ডের জমা অনুযায়ী মুনাফার হার নির্ধারণ না করা শরী'আহর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ইসলামী বীমার জন্য স্বতন্ত্র আইন

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার জন্য স্বতন্ত্র আইন আমাদের দেশে নেই। দেশবরেণ্য আলিমগণ কর্তৃক গঠিত শরী'আহ বোর্ড এর মতামতের ভিত্তিতে প্রচলিত বীমা আইনের আলোকে ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের কার্যক্রম চলছে। যার ফলে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার মাঝে থেকেই ইসলামী বীমা কোম্পানী পরিচালিত হচ্ছে। যেমন সকল বীমা কোম্পানীকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে অর্থ জামানত হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখতে হয়, ইসলামী বীমার জন্য সে অর্থ ইসলামী ব্যাংকে রাখার সুযোগ দেয়া হলে জমাকৃত জামানতের লভ্যাংশ গ্রাহকদের মাঝে ফেরত দেয়া যেত। এতে গ্রাহকরা লভ্যাংশ বেশী পেত।

ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ পরিচালক না থাকা

ইসলামী বীমার জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা হলো, পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠা ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচালনা পরিষদ। বাংলাদেশে হাতে গোনা যে কয়েকটি ইসলামী বীমা কোম্পানী রয়েছে তার অধিকাংশ পরিচালক কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন এবং বাস্তব জীবনেও ইসলামের পূর্ণ

www.pathagar.com

অনুসারী নন। যার ফলে পুঁজিবাদী মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠা এ সকল পরিচালক ব্যবসার কৌশল হিসেবে সম্পদ অর্জনের জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানী দাঁড় করায়। তাই ইসলামের কথা বলা হলেও ইসলামী বিধান মোতাবেক কোম্পানীর সকল কার্যক্রম পরিচালনায় তেমন আগ্রহ এ সকল পরিচালকদের থাকে না। ইসলামী বীমা কোম্পানীতে শরী'আহ বোর্ড থাকলেও কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই; বরং মাঝে মাঝে শরী'আহ বোর্ডের মিটিং করে মেম্বারদের একটি সম্মানী দেয়া হয় এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য মিটিং এর এ ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়।

দক্ষ কর্মী বাহিনীর অভাব

ইসলামী বীমা কোম্পানী পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মীবাহিনীর অভাব রয়েছে। বিশেষ করে কোম্পানী যারা পরিচালনা করেন যথা কোম্পানীর এমডি, ডিএমডি এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ইসলামী বীমা কোম্পানীর অধিকাংশ কর্মকর্তা প্রচলিত সূদী বীমা কোম্পানী হতে আসার কারণে ইসলামী আদর্শের আলোকে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার তেমন আগ্রহ তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় না। তা ছাড়া তাদের ইসলামী বীমা পরিচালনার দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়েও সংশয় রয়েছে। কারণ যে কর্মকর্তা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, তার পক্ষে অধীনস্থ জনগোষ্ঠীকে ইসলামী বিধান মোতাবেক পরিচালনা করা বাস্তবে সম্ভব নয়। ফলে প্রচলিত বীমা কোম্পানীর ন্যায় তারা ইসলামী বীমা কোম্পানী পরিচালনা করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত কর্মীরা ইসলামের অনুসারী হলেও বাস্তবে বীমা পেশায় দক্ষ নয়। যার ফলে গ্রাহককে বীমার সুবিধা সঠিকভাবে তারা বোঝাতে ব্যর্থ হন। এর ফলে গ্রাহকরা বীমার ঝুঁকির চেয়ে লভ্যাংশ পাওয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং লভ্যাংশ কাঙ্ক্ষিত মানের না হলে মনোক্ষুণ্ন হয় এবং ইসলামী বীমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করে থাকে।

ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায়

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- ইসলামী বীমার জন্য প্রচলিত বীমা আইন পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রচলিত বীমার যে যে ধারার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের আপত্তি রয়েছে, নতুন বীমা আইনে তা সংশোধন করতে হবে।
- ইসলামী বীমাতে গারার নেই বলে প্রচারণা চালানো হলেও গ্রাহকের মুনাফা পাওয়া, সমর্পণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'গারার' রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণের মতামতের ভিত্তিতে কোম্পানীর সকল স্তর থেকে গারার দূর করে সচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে। নতুন আইনের ক্ষেত্রে গারার দূর করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক। বিশেষ করে

www.pathagar.com

সমর্পণের ক্ষেত্রে তাবাররু' ফান্ড বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূলধন ফেরত দেয়ার বিধান থাকা জরুরী। প্রকল্প ভেদে টাকা জমার পরিমাণ অনুযায়ী ম্যাচুরিটি হার নির্ধারণ করা আবশ্যক।

- কোম্পানী পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব অনুসারী এবং ইসলামী বীমায় পারদর্শী এমন ব্যক্তিদের প্রধান কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ দেয়া আবশ্যক। এমন ব্যক্তির সংখ্যা অপ্রতুল হলে বিশেষভাবে বাছাই করে কিছু ব্যক্তিকে কোম্পানীর খরচে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এফসিএসহ উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য সহযোগিতা করা যেতে পারে।
- ইসলামী জীবনাদর্শকে মনেপ্রাণে ভালোবাসেন এবং বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলেন এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নতুন নতুন ইসলামী বীমা কোম্পানী চালু হওয়া আবশ্যক। এর ফলে ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি তৈরী হবে এবং সাধারণ জনগণও মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবে।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বীমা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা গ্রাহককে অধিক মুনাফা প্রদানের ঘোষণা দেন এবং সমর্পণ ভ্যালু সম্পর্কে কিংবা বিনিয়োগ নিয়ে কিস্তি পরিশোধ না করলে শেষ পরিণতি সম্পর্কে গ্রাহককে ধারণা না দেয়ায় এ সকল গ্রাহক সন্তোষজনক মুনাফা না পেয়ে হতাশ হন। এর ফলে সমাজে বীমা সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা চলছে।
- নামকা ওয়াস্তে শরী'আহ বোর্ড না রেখে কার্যকরী শরী'আহ বোর্ড রাখতে হবে এবং শরী'আহ বোর্ড এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে কোম্পানী শরী'আহ বোর্ডের নিকট জবাবদিহী করতে এবং শরী'আহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত কিংবা পরামর্শ মানতে বাধ্য হয়।

উপসংহার

কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে যুগের চাহিদানুসারে আলিমগণের ইজমা-এর ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ইসলামী বীমার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা না থাকায় শত প্রতিকূলতার মাঝে ইসলামী বীমার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। আমাদের দেশেও ইসলামী বীমার মাঝে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যমান এ ত্রুটিসমূহ দূর করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী বীমা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানো জরুরী। এজন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসা এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখা আবশ্যক।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৩

যৌতুক প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

কামরুজ্জামান শামীম*

[**সারসংক্ষেপ:** *যৌতুক এ দেশের জাতীয় জীবনে একটি নির্মম এবং কলঙ্কজনক অভিশাপ। এটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিনিয়ত অসংখ্য নারী এ ঘৃণ্য ব্যাধির শিকার হচ্ছে। এমনকি পরিণতিতে মৃত্যুর শিকার হচ্ছে বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এটি নারীর মৌলিক মানবাধিকার এবং সংবিধান পরিপন্থি। সামাজিক অসচেতনতা, দরিদ্রতা, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং পরধনে বিলাসিতার মানসিকতাই মূলত এই সমস্যাটিকে প্রকট করে তুলছে। যৌতুক শুধু নারীর জীবনকেই বিপর্যস্ত করে তুলছে না, অনেকক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও দেশকেও বিপন্ন করে তুলছে। সমাজ সচেতনতা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ধর্ম নিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমস্যাটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এর পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এ সমস্যারই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।]*

যৌতুকের পরিচয়

যৌতুক বাংলা শব্দ। এর প্রতিশব্দ পণ। দু'টোই সংস্কৃত থেকে এসেছে। বিবাহে বরকে কনেপক্ষ শর্ত হিসেবে যে সব মূল্যবান সম্পদ দেয় তাকেই যৌতুক বলা হয়।[১] হিন্দি এবং উর্দূতে একে "দহেজ" বলা হয়।[২] ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে "Dowry"। এর অর্থ হচ্ছে, বরপণ; বিবাহের সময় বরকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পত্তি।[৩] আরবী ভাষায় "البائنة" (আল-বা'ইনাহ) ও "الدوطة" (আদ-দুতাহ) শব্দদ্বয়[৪] দ্বারা যৌতুক বুঝানো হয়। প্রচলিত অর্থে বরপক্ষ কনেপক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক যা কিছু আদায় করে থাকে তার নাম যৌতুক।

---

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ১০১৫

২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, খ. ৮, পৃ. ৪৫৫

৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত, *ইংরেজি-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৫, পৃ. ২২৭

৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *বাংলা- ইংরেজি- আরবী ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৬২১

www.pathagar.com

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, "বিবাহের চুক্তি অনুসারে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে যে সম্পত্তি বা অর্থ দেয় তাকে যৌতুক বা পণ বলে"।[৫]
ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "Dowry: The property that a wife or a wife's family give to her husband upon marriage" অর্থাৎ যৌতুক হল বিবাহ উপলক্ষে কন্যা বা কন্যার পরিবারের পক্ষ থেকে বরকে প্রদেয় সম্পদ।[৬]

বাংলাদেশের আইনে যৌতুকের পরিচয়

বাংলাদেশের ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুকের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly-

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or
(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or to any other person;

[at the time of marriage or at any time] before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or mehr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies. "বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে, এই আইনে "যৌতুক" বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা "মূল্যবান জামানত" কে বুঝাবে, যা-

(ক) বিবাহের এক পক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা
(খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ মজলিসে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে, বিবাহের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে যৌতুক বলতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাবে না।"[৭]

---

[৫]. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫
[৬]. *Encyclopaedia of Britannica*, V. 4, p. 205
[৭]. *যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০*, আইন নং ৩৫, ধারা নং ২

www.pathagar.com

২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করা হয়। তাতেও যৌতুকের সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়। এ আইনটি ২০০৩ সালে আবার সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে যৌতুকের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে :

"যৌতুক" অর্থ

(ক) কোন বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বরপক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসেবে বিবাহের কনেপক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ; অথবা

(খ) কোন বিবাহের কনেপক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বরপক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসেবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।"[৮]

যৌতুক প্রথার প্রচলন

যৌতুক প্রথার সূচনা হয়েছিল ভারতের হিন্দু সমাজ থেকে। যার ফলশ্রুতিতে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে এর প্রচলন হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মে পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে কন্যার কোন অধিকার থাকে না। তাই বিবাহের সময় যৌতুকের মাধ্যমে একবারে আদায় করে নেয়। পরবর্তীতে এটি মুসলিম সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে।

যৌতুক প্রথার উৎপত্তি হিসেবে কন্যাদান বা স্ত্রীদান নামক বৈদিক যুগের একটি ধর্মীয় রীতিকে গণ্য করা হয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নেই। বিবাহের পর থেকে কন্যার দায় দায়িত্ব আর পিতার উপর থাকে না। বরং এটা কন্যার স্বামীর উপর বর্তায়। এ জন্য বিবাহের সময় পিতা কন্যাদান রীতির মাধ্যমে কন্যার স্বামীকে খুশি হয়ে কিছু উপহার বা দক্ষিণা দেন। আবার পিতার দক্ষিণা ছাড়া কন্যাদান তথা বিবাহ ধর্মীয়ভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বৈদিক যুগের সামর্থ্যনুযায়ী দক্ষিণাই কালাতিক্রমে বর্তমানে বাধ্যতামূলক ও সংখ্যাতিরিক্ত যৌতুকে পরিণত হয়েছে।

হিন্দু সমাজের কুলিণত্ব বা শ্রেণিবৈষম্য এ যৌতুক প্রথা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শুরুর দিকে কন্যাদান উচ্চ বর্ণের হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলন ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায়, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণরা প্রচুর যৌতুক পাওয়ার আশায় শতাধিক বিবাহ করত। এ সব স্ত্রী তাদের পিতৃগৃহেই থাকত। স্বামীরা বছরে একবার দেখা করতে

---

[৮]. *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন)* ২০০৩, আইন নং ৮, ধারা নং ২ (ঞ)

www.pathagar.com

আসত এবং প্রচুর আতিথেয়তা ভোগ করে যাওয়ার সময় অনেক যৌতুক নিয়ে যেত।[৯] পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কুলিণত্বের নতুন মাত্রা যোগ করে। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যায় এবং চাকুরির ক্ষেত্রে তাদের কদর বৃদ্ধি পায়। তখন কন্যাপক্ষ বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বরপক্ষকে আকর্ষণের চেষ্টা করত।[১০] অন্য দিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথে মোটা অংকের যৌতুক বা প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে আত্মীয়তা করত। যার ফলে হিন্দু সমাজে যৌতুক কালক্রমে সামাজিক প্রথার রূপ ধারণ করে। হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রচলনের কারণসমূহ

১. **হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব :** বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু প্রাচীনকাল থেকেই পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। ফলে বিবাহ শাদিসহ নানান বিষয়ে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম সংস্কৃতিতে পড়েছে। কালক্রমে তা মুসলিম সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিণত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রচলনের পিছনে হিন্দু সংস্কৃতির বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

২. **শরীয়তের বিধানের প্রতি অবজ্ঞা :** যৌতুক ইসলামে কোনভাবেই অনুমোদিত নয়। হাদীসে যৌতুকের প্রতি নিষেধাজ্ঞাসহ এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১১] যৌতুকের বিপরীতে ইসলাম স্বামীর ওপর স্ত্রীর মহর আবশ্যিক করেছে। ইসলামের শাশ্বত বিধানকে আজ সর্বক্ষেত্রে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা হচ্ছে। যদি অন্তরে আল্লাহ্র ভয় এবং নারীর মর্যাদা ও তার আর্থিক অধিকার সুরক্ষায় ইসলাম যে বিধি বিধান দিয়েছে এর প্রতি সামান্য সম্মানবোধ থাকে তাহলে কারো পক্ষে এ ধরনের জঘন্য অপকর্ম করা সম্ভব নয়।

৩. **লোভী মানসিকতা :** মানুষের লোভী মানসিকতা বাংলাদেশে যৌতুক অবাধে প্রচলনের পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আমাদের সমাজে অনেক লোক যৌতুককে ঘৃণা করে। কিন্তু ফ্রি বা বিনা কষ্টে অর্জিত জিনিসপত্রের প্রতি সবারই

---

৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

১১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান আল-বাগদাদী, *আল-মুখাল্লাসিয়াত*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমা, অনুচ্ছেদ : জুযউন মিন হাদীসিল মুখাল্লাস, কাতার : ওযারাতুল আওকাফ ওয়া শুয়ূনিল ইসলামিয়া লি দাওলাতি কাতার, ২০০৮, খ. ৪, পৃ. ১১২, হাদীস নং ৩০৮৫

قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن تزوَّجَ امرأةً لعزِّها لم يزدْه اللهُ إلا ذُلاً، ومن تزوَّجَها لِمَالِها لم يزدْه اللهُ إلا فقراً، ومَن تزوَّجَ امرأةً لحُسنِها لم يزدْه اللهُ إلا دناءةً، ومَن تزوجَ امرأةً ليغضَّ بصرَه ويُحصنَ فرجَه ويصلَ رحمَهُ كانَ ذلكَ منه وبوركَ له فيها وبارَكَ اللهُ لها فيه»

www.pathagar.com

লোভ-লালসা থাকে। এ জন্য পাত্রপক্ষ যৌতুক বা ঘর সাজানোর উপকরণ (ফ্রিজ, টিভি, ফার্নিচার) উপঢৌকন পেতে দারুন উদগ্রীব থাকে।

৪. **দরিদ্রতা :** বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রসারের ক্ষেত্রে দরিদ্রতা অনেকাংশে দায়ী। দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের ছেলেদেরকে যৌতুকের শর্তে বিবাহ করিয়ে স্বাবলম্বী করার স্বপ্ন দেখে। ফলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উচ্চ মূল্যের যৌতুক দিয়ে হলেও নিজের কন্যাকে পাত্রস্থ করতে বাধ্য হয়।

৫. **বেকার সমস্যা :** বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে অনেক বেকার যুবক স্বচ্ছলতার আশায় যৌতুক নিয়ে বিবাহ করতে আগ্রহী থাকে। তারা ব্যবসায় পুঁজি বা চাকুরির Donation এর নামে যৌতুকের বিনিময়ে বিবাহের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

৬. **অজ্ঞতা ও অসচেতনতা :** সামাজিক অসচেতনতা, অশিক্ষা, যৌতুক বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং যৌতুকের অশুভ পরিণতির ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে সমাজে যৌতুক প্রথা বেড়েই চলছে।

৭. **বিত্তবানদের আভিজাত্যবোধ :** বিশেষত বিত্তবান ও ধনাঢ্য পরিবারগুলোর তথাকথিত আভিজাত্যবোধ ও খ্যাতি অর্জনের বাসনাও যৌতুকের প্রচলনকে মজবুত করছে। শিক্ষিত ও ধনাঢ্য পরিবারের পাত্র পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যত যৌতুক দাবি করে না ঠিকই কিন্তু তারা আকার ইঙ্গিতে আভিজাত্য ও খ্যাতি রক্ষায় নগদ অর্থ, জমি, ফ্ল্যাট ও ঘরের আসবাবপত্র উপঢৌকন হিসেবে পেতে উদগ্রীব থাকে। কনেপক্ষ নিজেদের মর্যাদা ও মুখ রক্ষার খাতিরে তখন উপহার-উপঢৌকনের নামে যৌতুক দিতে বাধ্য হয়।

৮. **বাল্যবিবাহ :** বাল্যবিবাহের কারণেও যৌতুকের প্রসার ঘটছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে সামাজিক প্রথা হিসেবে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়। অনেক সময় মোটা অংকের যৌতুক মেয়ের বয়সের দিকটিকে উপেক্ষিত করে তোলে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়ের সুখের চিন্তা করে অধিক যৌতুকের বিনিময়ে হলেও ভাল অবস্থা সম্পন্ন পাত্র হাত ছাড়া করতে চায় না।

যৌতুকের তথ্যচিত্র

যৌতুকের কারণে নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে যৌতুক। আমরা প্রতিদিনের পত্রিকা হাতে নিলে দেখি যৌতুকের কারণে দেশের কোথাও না কোথাও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। আবার কোথাও পাষণ্ড স্বামী ও তার পরিবারের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হবার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কেউবা চিকিৎসা নিয়ে ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর সূত্র মতে, ২০১২ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর এই নয় মাসে ৬৪৮ জন বিবাহিত নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে

www.pathagar.com

২১৭ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে এক জন নারী বাল্য বিবাহের শিকার। এছাড়া ৪১৯ জন বিবাহিত নারী বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়কালে ১২ জন বিবাহিত নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌতুক সহিংসতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ০১ জন পুরুষ নিহত ও ১০ জন পুরুষ আহত হন এবং যৌতুকের কলহের কারণে ০৩ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে ও ০১ জনকে আহত করা হয়েছে।[১২] এ পরিসংখ্যান তো মানবাধিকার সংস্থার নয় মাসের রিপোর্ট। কিন্তু বাস্তবে গ্রামেগঞ্জে আরো অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। পত্র পত্রিকায় এ সবের কিছু লোমহর্ষক খবর প্রচারিত হচ্ছে। এ সব খবরে সভ্য সমাজের সবারই শরীর শিহরে ওঠছে। আবার অনেক ঘটনা নানা কারণে আড়ালে থেকে যাচ্ছে। এই সকল নির্যাতনের পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা শুধু ভুক্তভোগী পরিবারগুলোই আঁচ করতে পারে।

জাহিয যৌতুক নয়

বিবাহ শাদীতে ইসলামের সমর্থিত যে কয়টি রীতি বা প্রথার অনুসরণ রয়েছে তন্মধ্যে একটি জাহিয। জাহিয দ্বারা বর্তমান সমাজে প্রচলিত যৌতুককে বুঝায় না। জাহিয হচ্ছে, কন্যাকে দেয়া পিতার উপহার। অর্থাৎ কনের পিতা বা পরিবার স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে কনেকে বিবাহের পর যে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করে। এটি ইসলামী সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য। প্রচলিত যৌতুকের সাথে এর কোন মিল নেই। এ দু'টো বিষয়কে এক মনে করা মারাত্মক বিভ্রান্তি। কেননা জাহিয পিতা কন্যাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করেন। আর এর মালিক হয় কন্যা নিজে। স্বামী বা তার পরিবারের কেউ এর মালিক নয়। এতে স্বামী বা তার পরিবারের কেউ দাবি বা চাপাচাপি তো দূরের কথা, কন্যার পক্ষ থেকেও কোন দাবি থাকে না। বরং পিতা সামর্থ্যনুযায়ী কন্যাকে তা দিয়ে থাকেন। আবার নাও দিতে পারেন। পক্ষান্তরে যৌতুক স্বামী বা তার পরিবারের দাবি বা শর্তের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়। যৌতুকের সম্পদে কনের বিন্দু মাত্রও মালিকানা স্বীকার করা হয় না। বরং এর মালিক হয় স্বামী ও তার পরিবার। আর এতে কোন ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। কনের বাবা বাধ্য হয়ে কন্যার সুখের কথা চিন্তা করে বর ও তার পরিবারের দাবী-মেটাতে যৌতুক দয়ে থাকেন। সুতরাং প্রচলিত যৌতুকের সাথে ইসলামের জাহিযের কোন প্রকার মিল নেই।

জাহিয ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপূর্ব নির্দশন। নবী করীম স.-এর যুগ থেকে এর প্রচলন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. স্বীয় আদরের দুলালী ফাতেমা রা. কে জাহিয বা উপহার দিয়েছিলেন। হযরত আলী রা. বলেন, "রাসূলুল্লাহ স. ফাতেমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন একটি পাড়ওয়ালা কাপড়, একটি পানির পাত্র ও একটি চামড়ার তৈরী বালিশ-যার মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ইযখির খর ভর্তি ছিল।"[১৩] হযরত আলী রা. থেকে

---

১২. *প্রথম আলো*, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২

১৩. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ১. পৃ. ৪৪৩, হাদীস নং ৬৪৩

www.pathagar.com

বর্ণিত অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী কারীম স. এ কয়টি জিনিস ছাড়াও দু'টো যাঁতা এবং পাকা মাটির একটি পাত্র ফাতেমা রা. কে জাহিয হিসেবে দিয়েছিলেন।

আজন্ম পরম আদর ও সোহাগে লালিত-পালিত কন্যার বিবাহের পর কন্যাকে সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার সামগ্রী দেয়ার ক্ষেত্রে পিতার মমত্ব, সহানুভূতি ও প্রয়োজনের বিষয়টি ক্রিয়াশীল থাকে। কেননা বিবাহের পর কন্যা পিতার সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরিচিত পরিবেশে নতুন সংসার রচনা করে। এ সময় তার সংসার গঠনে বহু রকমের জিনিস পত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন পিতা যদি জরুরী কিছু জিনিসপত্র দিয়ে কন্যার সংসার গঠনে বাস্তবভাবে সাহায্য করেন, তবে তা মেয়ের জন্য যেমন প্রশান্তির উপাদান হয়, তদ্রূপ পিতার মমত্ববোধ তাতে প্রকাশ পায় এবং কর্তব্যও পালিত হয়। তবে এ জাহিয পিতার জন্যে আবশ্যিক নয়, বরং একান্তই সৌজন্য।

অনেকে অজ্ঞতাবশত জাহিয ও যৌতুক একই পর্যায়ের মনে করেন। তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর কন্যা ফাতেমা রা.-কে দেয়া উপহারকে যৌতুক হিসেবে ধারণা করেন এবং বর্তমানে প্রচলিত যৌতুককে কোন ধরনের অশোভনীয় কাজ মনে করেন না। কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল ও ভ্রান্তিকর। কেননা নবী করীম স.-এর জাহিয ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উপহার। আর বর্তমানে প্রচলিত যৌতুক হচ্ছে শর্ত করে জোরপূর্বক আদায়। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ স. ছিলেন হযরত আলী রা. এর অভিভাবক। সম্ভবনা আছে যে, তিনি এ জিনিসগুলো হযরত আলী রা. এর পক্ষ থেকে প্রেরণ করেছিলেন। কারণ হযরত আলী রা. এর ঘরে বিবাহের সময় এ ধরনের আসবাব বা জিনিসপত্র ছিল না।

রাসূলুল্লাহ স.-এর ফাতেমা রা. কে উপহার দেয়ার ঘটনার আলোকে কেউ কেউ আবার বিবাহের সময় কন্যাকে উপহার-উপঢৌকন দেয়া মাসনূন বা সুন্নাত মনে করেন। কিন্তু উসূলে ফিকহের বিধান মতে শুধু এতটুকু দ্বারা কোন আমল সুন্নাত প্রমাণিত হয় না। বরং মুবাহ বা বৈধ প্রমাণিত হয়। যদি এটি মসনূন হত তাহলে নবী করীম সা. সাহাবায়ে কিরামকে এরূপ আমলের প্রতি উৎসাহিত করতেন। উম্মুল মুমিনীনগণকে পিত্রালয় থেকে কিছু উপহার-উপঢৌকন দেয়া হতো বা নবী করীম স. তার অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রেও জাহিয বা উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। কিন্তু কোন বর্ণনাতে এমন কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

মহর প্রদান বাধ্যতামূলক

বিবাহতে মহর বা মহরানা দেয়া স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলামী আইনে মহর সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর প্রাপ্য। মহর হচ্ছে, বিবাহ বন্ধনের প্রেক্ষিতে স্বামী তার স্ত্রীকে যে অর্থ-সম্পদ প্রদান করে।[১৪]

جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ، وَقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةٍ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفُ الْإِذْخِرِ

১৪. ড. ইবরাহীম মাদকুরের তত্ত্বাবধানে রচিত, *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, ইস্তাম্বুল : দারুদ দা'ওয়া, ১৯৮৯, পৃ. ৮৮৯

www.pathagar.com

রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থ প্রণেতার মতে, "মহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বুঝায়, যা বিবাহের বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়। হয়ত বিবাহের সময়ই তা ধার্য হবে, নয়তো বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে।"[১৫]

মোটকথা, শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর জিম্মায় একটি যৌক্তিক বিনিময় নির্ধারিত হয়, যাকে ফিকহের পরিভাষায় মহর বলে। আর মূলত মহর একজন নারীর নারীত্ব বৈধ উপায়ে একজন পুরুষের কাছে সমর্পণের একটি প্রতীকী সম্মানী। এটা নারীর মূল্য নয় যে, তা পরিশোধ করলেই মনে করা যাবে, নারী নিজেকে স্বামীর হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। তেমনি মহর শুধু কথার কথাও নয় যে, ধার্য করা হবে কিন্তু আদায় করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। বরং ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন কোন পুরুষ স্ত্রীকে ঘরে আনবে তখন মর্যাদার সঙ্গে আনবে এবং এমন কিছূ উপহার দিবে যা তাকে সম্মানিত করে। তাই মহর বিবাহ বা দাম্পত্যের একটি আবশ্যিক আর্থিক বিধান। যা স্বামী পরিশোধ করবে এবং স্ত্রী পাবে। এটা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য আল্লাহর দেয়া আর্থিক অধিকার। স্ত্রীর এ প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক। এ অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু নির্দেশনা এসেছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

"এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়- এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদের ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য- ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক (মহর) দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"[১৬]

---

[১৫]. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, *রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ২৩০

إنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد

[১৬]. আল-কুরআন, ৪ : ২৪

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদের অন্যত্র সন্তুষ্টচিত্তে মহর প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, "আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।"[১৭]

এ সব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহর দেয়া সকল বিবাহতে ও সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব। এমনকি আক্‌দের সময় যদি ধার্য করা নাও হয়, তবুও সে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হওয়ার সাথে সাথে মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। নবী করীম স.ও এ বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "বিবাহের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে (মহর) তোমরা স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করো।"[১৮]

এমনকি বিবাহের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতেও রাসূলুল্লাহ্ স. স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। যেমনটি আলী রা.-এর ঘটনা হতে জানা যায় যে, "তিনি যখন ফাতেমা রা. কে বিবাহ্ করার পর তার নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন নবী করীম স. তাকে কোন জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তার নিকটে যেতে তাকে নিষেধ করলেন। আলী রা.বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, তুমি তাকে তোমার বর্মটি দিয়ে দাও। তখন তিনি তাকে বর্মটি দিয়ে তার কাছে প্রবেশ করলেন।"[১৯]

বর্তমান যুগে মহর নির্ধারণ একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সাময়িক নাম জাহির করা বা সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য মোটা অংকের মহর নির্ধারণ করা হয়। যা পরিশোধের কোন মানসিকতা থাকে না। ছেলেপক্ষ ধরেই নেয় যে, মোটা অংকের মহর নির্ধারণ সামাজিকভাবে লোক দেখানোর জন্য। বাস্তবে তা পরিশোধের জন্য নয়। ফলে অনেকাংশেই মহর অনাদায় থেকে যায়। নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যেমনটি জাহিলিয়্যাতের যুগের প্রচলন ছিল। সে সময়ে বিপুল পরিমাণে মহর ধার্য করা হতো। মেয়েপক্ষ পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চাপ প্রয়োগ করত। ফলে দু'পক্ষের মাঝে নানা

---

[১৭]. আল-কুরআন, ৪ : ৪

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

[১৮]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ্, অনুচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়াশতারিতু লাহা দারাহা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ্, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-২১৩৯

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

[১৯]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ্, অনুচ্ছেদ : আর-রাজুলু ইয়াদখুলু বিইম্‌রায়াতিহি কাবলা আই-ইয়ানকাদাহা শাইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭৯, হাদীস নং-২১২৬

أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ»، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

www.pathagar.com

রূপ দর কষাকষি ও ঝগড়াঝাটি হতো। পরিণামে সমাজে দেখা দিত নানাবিধ জটিলতা। বর্তমান মুসলিম সমাজে মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থাই দেখা যায়। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোন্নতির যুগেও জাহিলিয়্যাত নতুন করে ফিরে এসেছে। অথচ ইসলামের বিধান হলো যে, মহর স্বামীর সাধ্য বা সামর্থনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। যা পরিশোধ করা স্বামীর পক্ষে সহজ হয়। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "সবচেয়ে উত্তম মহর হচ্ছে তা, যা আদায় করা খুবই সহজসাধ্য।"[২০]

আবার মেয়েপক্ষের চাপে বা সামাজিক মর্যাদা রক্ষার খাতিরে স্বামী বিপুল পরিমাণ মহর স্বীকার করে নেয়। কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে, সে এর কিছুই আদায় করবে না। ফলে এ ব্যাপারটি একটি প্রতারণায় পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে মহর পরিশোধ করার যদি নিয়ত না থাকে; আর বিপুল পরিমাণে মহর নির্ধারণ করে, তাহলে এটা বড় রকমের গোনাহের কাজ ও জঘন্য অপরাধে পরিণত হবে। নবী স. এরশাদ করেন, "যে লোক তার স্ত্রীর জন্যে কোন মহর ধার্য করবে, অথচ আল্লাহ জানেন যে, তা আদায় করার কোন ইচ্ছাই তার নেই। ফলে আল্লাহর নামে নিজের স্ত্রীকেই প্রতারিত করল এবং অন্যায়ভাবে ও বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্যে হালাল মনে করে ভোগ করল। সে লোক ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে বাধ্য হবে।"[২১]

বস্তুত মহর হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার ও স্বামীর কাছে তার নারীত্ব সোপর্দ করার প্রাক্কালে স্বামীর পক্ষ থেকে দেয়া মর্যাদার প্রতীক। অন্যদিকে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ স্ত্রী সম্ভোগের অধিকার লাভের একটি পুরস্কারও বটে। তাই বিবাহতে মহর ব্যবস্থা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কিছু বেধে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তা স্ত্রীর পাওনা ঋণ, যা পরিশোধ করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক।

ওয়ালীমা সুন্নত

ইসলামে যৌতুকের কোন স্থান নেই। বরঞ্চ বিবাহের সময় মেয়েপক্ষের তরফ থেকে বরযাত্রীদের জন্য আপ্যায়নের যে অনুষ্ঠান করা হয় তাও ইসলাম সিদ্ধ নয়। আমাদের দেশে রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে যে, বরপক্ষের মেহমানদের জন্য কনেপক্ষের

---

[২০]. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, *নায়নুল আওতার*, অধ্যায় : আস-সিদাক, অনুচ্ছেদ : জাওয়াযুত তাজবীয আলাল কালীল ওয়াল কাছীর ওয়া ইসতিহবাবুল কাস্দ্, মিসর : দারুল হাদীস, ১৯৯৩, খ. ৬, পৃ. ২০১ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

[২১]. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মাকতাবাতুশ শামিলা, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ২০০১, হাদীস নং-১৮৯৩২

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ لِمْرَأَةٍ صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللهِ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ

www.pathagar.com

খানাপিনার আয়োজন করা। অনেক সময় বরপক্ষের শর্ত থাকে, আমাদের ১০০ বা ২০০ লোক বরযাত্রী হবে। তখন কনের অভিভাবক বাধ্য হয়ে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে বরযাত্রীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। নিজের কাছে টাকা না থাকলে অন্যের নিকট থেকে ধার-দেনা করে হলেও এর ব্যবস্থা করে। শরীয়ত সিদ্ধ বিবাহতে কনেপক্ষের আপ্যায়নের বিধান নেই। খানাপিনার ব্যবস্থা হবে বরপক্ষের তরফ থেকে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় ওয়ালীমা বলা হয়। আর এটা সুন্নত।

ওয়ালীমা শব্দের অর্থ : ভোজসভা, সমাবেশ বা সম্মিলন।[২২] কেননা একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহিত জীবনে মিলিত হওয়া উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের একত্রিত করা হয় এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ জন্য এর নামকরণ করা হয় ওয়ালীমা। আর বিবাহের প্রচারের একটি উত্তম উপায় হচ্ছে ওয়ালীমার জিয়াফতের ব্যবস্থা। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে : "আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ রা. বিবাহ করার পর যখন রসূলুল্লাহ স. তার হাতে হলুদ রং দেখলেন তখন তাকে বললেন, এটা কী? আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ রা. বললেন, আমি এক মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের মহর দিয়ে বিবাহ করেছি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। তুমি ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর একটি বকরী দ্বারা হলেও।"[২৩]

রাসূল আকরাম স. নিজে যখন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা. কে বিবাহ করলেন, তখন তিনি একটি বকরী জবাই করে ওয়ালীমার জিয়াফত করেছিলেন। সে সম্পর্কে আনাস রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. যখন যয়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর সাথে ঘর বাঁধলেন, তখন তিনি লোকদের রুটি ও গোশ্ত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন।"[২৪]

উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, খানাপিনা বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা বরপক্ষের দায়িত্ব। আর তা বরের সাধ্যনুযায়ী হবে। রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করলে এ চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে যে, কনেপক্ষের তরফ থেকে কোন খানাপিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি বরং বরপক্ষই তাদের সাধ্যানুযায়ী ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছে।

---

২২. ড. ইবরাহীম মাদকুরের তত্ত্বাবধানে রচিত, *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৭

২৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : কাইফা ইউদআ লিল মুতাযাওবীজ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-৫১৫৫

لَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟»

قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

২৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেদ : কাওলিহী লা তাদখুলু বুয়ুতান নাবিয়্যি ইল্লা... আযীমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭, হাদীস নং-৪৭৯৪

أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا

www.pathagar.com

যৌতুকের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

বিবাহ হচ্ছে শরয়ী পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের সামাজিকভাবে সহাবস্থানের একটি পবিত্র বন্ধন। ইসলামের বিধান হচ্ছে, বিবাহতে নারী তার নারীত্ব স্বামীর কাছে সোপর্দ করার ফলে স্বামীর নিকটে একটি বিনিময় পাওয়ার অধিকারী হয়। যাকে মহর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু যৌতুক এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যৌতুকের মাধ্যমে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করে থাকে। যা সম্পূর্ণ অন্যায় ও জঘন্য অপরাধ। ইসলাম কোনমতেই তা অনুমোদন করে না। এ প্রথাটি ইসলাম প্রবর্তিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করে আল্লাহ তার লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার দরিদ্রতাই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে বংশ গৌরব লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার অসম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে তাকে দৃষ্টি অবনমিত রাখার জন্য অথবা নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিবাহ করে আল্লাহ তাকে সে স্ত্রীতে বরকত দেন। আর স্ত্রীর জন্যও তাকে বরকতময় বানিয়ে দেন"।[২৫] অর্থাৎ সবদিক থেকেই এ বিবাহ বরকতময় হয়।

যৌতুক প্রথা নির্মূলে রসূলুল্লাহ স.-এর এই বাণী যথেষ্ট। তিনি এ হাদীসে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন, যৌতুক তথা ধন-সম্পদের লোভে বিবাহ করলে আল্লাহ্ তার দরিদ্রতা আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর সম্মান বা বংশগৌরব লাভের আশায় বিবাহ করলে আল্লাহ তার লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা আরো বাড়িয়ে দিবেন। পাশাপাশি এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নৈতিক চরিত্র পরিশুদ্ধ রাখা এবং আদর্শ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই কেবল বিবাহ করতে হবে। এ হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়েছে, যৌতুক তথা শর্তারোপ করে কনেপক্ষ থেকে ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র বা যে কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করা গর্হিত অপরাধ।

যৌতুকের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আর তা হল, যৌতুকের মধ্যে অন্যের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া অবৈধভাবে লেনদেন হচ্ছে। আর ইসলাম অন্যের অর্থ-

---

[২৫]. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত,* অনুচ্ছেদ : মিন ইসমিহী ইবরাহীম, কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি., খ. ৩, পৃ. ২১, হাদীস নং ২৩৪২

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تزوَّجَ امرأةً لعزِّها لم يزدْه الله إلا ذُلاً، ومن تزوَّجَها لِمَالِها لم يزدْه الله إلا فقراً، ومَن تزوَّجَ امرأةً لحُسنِها لم يزدْه الله إلا دناءةً، ومَن تزوج امرأةً ليغضَّ بصرَه ويُحصنَ فرجَه ويصلَ رحمَهُ كانَ ذلكَ مِنه وبوركَ له فيها وبارَكَ الله لها فيه»

www.pathagar.com

সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া ভিন্ন পন্থায় গ্রহণ বা ভোগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।"[২৬]

সুতরাং যৌতুকের লেনদেন ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না। বরং যৌতুক গ্রহণ হারামের শামিল। আর তা শুধু হারাম তা-ই নয়, বরং এর প্রভাবে আরো অনেকগুলো হারাম ও কবীরা গুনাহ সম্পাদিত হয়। যেমন:

১. **হিন্দু বা বিজাতীয় প্রথার অনুকরণ :** যৌতুক হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে। এটি হিন্দুয়ানী রসম বা পৌত্তলিক সমাজের প্রথা; যে প্রথা হিন্দু ধর্মের উৎসজাত। যৌতুকের লেনদেনে হিন্দু বা পৌত্তলিক সমাজের অনুকরণ করা হয়। কোন মুসলিম পৌত্তলিক বা মুশরিকের রীতি নীতি অনুসরণ অনুকরণ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ স. এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন।[২৭]

২. **অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগতকরণ :** যৌতুকের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়। কেননা কনেপক্ষ বরপক্ষের চাপে বা সামাজিক প্রথা রক্ষার্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্থ-সম্পদ যৌতুক হিসেবে প্রদানে বাধ্য হয়। এ সম্পদ সম্পূর্ণরূপে বরপক্ষের জন্য অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ বা হরণ করার শামিল। ইসলামে এ ধরনের তৎপরতা সম্পূর্ণ হারাম। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের হাতেও তুলে দিও না।"[২৮]

৩. **দীনদারী ও চারিত্রিক গুরুত্ব হ্রাস :** যৌতুকের কারণে বর ও কনের চারিত্রিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বরং এ ক্ষেত্রে কনেপক্ষের কাছ থেকে বরপক্ষের অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তিই মুখ্য হয়ে ওঠে। অথচ হাদীস শরীফে

---

[২৬]. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

[২৭]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ : তাকলিমুল আজফার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১; হাদীস নং ৫৮৯২; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, কায়রো : মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩, খ. ১০, পৃ. ৪০৫, হাদীস নং-৫৮৯২

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ "

[২৮]. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

www.pathagar.com

দীনদারী ও চরিত্রের দিকটি প্রাধান্য দেয়ার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "মেয়েদেরকে সাধারণ চারটি বিষয় দেখে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য এবং দীনদারী। তবে তুমি দীনদার মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর। তোমার কল্যাণ হবে।"[২৯]

৪. **জুলুম ও নির্যাতন :** যৌতুক গ্রহণ বড় ধরনের জুলুম ও জঘন্য পর্যায়ের নির্যাতন। এই জুলুম ও নির্যাতনের শিকার যে শুধু কনে নিজে তা-ই নয়। বরং কনের গোটা পরিবার দুর্ভোগে পড়ে এবং অভাবনীয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রে কন্যার দায় মেটাতে গিয়ে গোটা পরিবার সর্বশান্ত হয়ে পড়ে।

৫. **সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি :** সর্বগ্রাসী যৌতুক প্রথার ভয়ানক আক্রমণে সমাজে নানা ধরনের অপকর্ম ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। যৌতুক ছাড়া বিবাহ না হওয়া বা বিলম্বে বিবাহ হওয়ার দরুন বেড়ে চলে অবৈধ প্রণয়, ব্যভিচার। ফলে গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। যৌতুক অনাদায়ে স্ত্রীর ওপর অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন চলে। এমনকি হত্যা ও আত্মহত্যাও সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি যৌতুককে কেন্দ্র করে দু' পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকাদ্দমা ও খুন-জখমের মতো ঘটনাও ঘটে।

যৌতুক গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে কোনভাবেই বৈধ নয়। যৌতুকের কারণে যেমন ইহকালীন বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, অপকর্ম, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ন বেড়ে যায়; তেমনি পরকালে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এতে কোন ধরনের সংশয় নেই।

প্রচলিত আইনে যৌতুকের শাস্তি

যৌতুক মহামারী আকারে দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার যৌতুক বিরোধী একটি আইন পাস করে। যা "যৌতুক নিরোধ আইন" নামে পরিচিত। এ আইনের (৩ ধারা) অনুযায়ী যৌতুক নেয়া বা দেয়ার জন্য শাস্তি ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডই হতে পারে। যে ব্যক্তি যৌতুক নেয়া বা দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করবে তারও একই রকম শাস্তি হবে এবং যে ব্যক্তি যৌতুক দাবী করবে তারও (৪ ধারা অনুযায়ী) একই রকম শাস্তি হবে। এ ছাড়া যৌতুক গ্রহণের জন্য যদি কেউ উদ্বুদ্ধ করে বা প্ররোচিত করে সে ব্যক্তিও অপরাধী হবে এবং তার শাস্তি হবে।

---

[২৯]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: আল-আকফাউ ফিদদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং-৫০৯০

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

www.pathagar.com

যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ এর ৩৫ নং আইনের ৩ নং ও ৪ নং ধারায় যথাক্রমে বলা হয়েছে-

If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to [five years and shall not be less than one year, or with fine, or with both]. "এই আইন কার্যকরী হবার পর যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক নেয় বা দেয় বা নেওয়া বা দেওয়ায় সহায়তা করে, তাহলে সে সর্বাধিক পাঁচ বৎসরের এবং এক বৎসরের নিম্নে নয়, মেয়াদের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।"[৩০]

If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to [five years and shall not be less than one year, or with fine, or with both]. "এই আইন কার্যকারী হবার পর কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে, সে সর্বাধিক পাঁচ বৎসরের এবং এক বৎসরের নিম্নে নয়, মেয়াদের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।"[৩১]

এই আইন পাশ করার পরও যৌতুকের অপরাধ দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কারণে ২০০০ সালে তৎকালীন সরকার 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন' সংসদে পাশ করে, যা ২০০৩ সালে সংশোধন হয়। এ আইনের (১১-ক ধারা) অনুযায়ী যৌতুকের কারণে কোন নারীর মৃত্যু ঘটলে বা ঘটানোর চেষ্টা করা হলে অপরাধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে। আর যদি মারাত্মক জখম করা হয়, তাহলে (১১-খ ধারা) অনুযায়ী অপরাধীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে। আবার যদি জখম সাধারণ হয়, তাহলে (১১-গ ধারা) অনুযায়ী অপরাধীকে ১ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)। ৮ নং আইনের ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে, "যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা,

---

[৩০]. *যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০*, আইন নং ৩৫, ধারা নং ৩

[৩১]. *যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০*, আইন নং ৩৫, ধারা নং ৪

www.pathagar.com

অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন [কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (simple hurt) করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) মারাত্মক জখম (grievous hurt) করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক বার বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।”[৩২]

যৌতুক প্রথা বন্ধ না হওয়ার কারণ

যৌতুক প্রথা নিরসনের জন্য যৌতুক নিয়ন্ত্রন আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনে যৌতুক প্রদানকারী ও যৌতুক গ্রহণকারী উভয়কেই শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ আইনে কঠোর বিধানাবলী সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য হল মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নির্যাতনের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। আইনী বিধান ছাড়াও এ লক্ষ্যে অন্যান্য সামাজিক প্রয়াস যে চলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার পরেও মানবতাবিরোধী নির্যাতনমূলক এ জঘন্য সামাজিক কুপ্রথাটি বন্ধ হচ্ছে না। বরঞ্চ যৌতুক প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই এ মহামারীতে আক্রান্ত হচ্ছে। যৌতুকের কারণে হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার ও নিপীড়ন বেড়েই চলছে। যৌতুক প্রবণতা বন্ধ না হওয়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল:

ক. ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব : যৌতুক প্রথা বন্ধ না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব। বিজাতীয় কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবাহে বর্তমান মুসলিম সমাজ গা ভাসিয়ে চলছে। বিবাহ-শাদীসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিধর্মীদের রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ করছে এবং প্রগতির অন্তরায় এ অজুহাত তুলে দীনি ও বরকতময় ইসলামী কৃষ্টিকে উপেক্ষা করছে। যার ফলশ্রুতিতে যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং তা আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ স. বিবাহ-শাদীতে

[৩২]. *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন) ২০০৩*, আইন নং ৮, ধারা নং ১১

www.pathagar.com

দীনদারীকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "তোমরা দীনদারীকে প্রাধান্য দাও।"[৩৩] অন্য আরেক হাদীসে মহা নবী স. ঘোষণা করেছেন, "সবচেয়ে বরকতপূর্ণ বিবাহ হল যাতে খরচ কম হয়।"[৩৪] সুতরাং দীনদারী ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা যত কমতে থাকবে যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন সমাজে আরো তত বৃদ্ধি পাবে।

খ. আইনের কঠোর বাস্তবায়ন না হওয়া : যৌতুক প্রথা বন্ধের জন্য ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে নারী নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধের নিমিত্তে মৃত্যুদণ্ডের মত সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে নারী এর কোন সুফল পাচ্ছে না। কারণ আইনের কঠোর বাস্তবায়ন নেই। আসামী প্রভাবশালী হওয়ায় প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বা টাকার জোরে ভিকটিমের সাথে আপোষ মীমাংসা করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আপোষে না আসতে চাইলে হুমকি-ধমকি ও বিভিন্ন কুট-কৌশল খাটিয়ে বিচার ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য পায়তারা চালায়। অন্যদিকে আইন শৃংখলা রক্ষাবাহিনীর অসাধু কর্মকর্তারা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে মামলার আইনী প্রক্রিয়া দুর্বল করে ফেলে। ফলে আদালত সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে না।

যৌতুক প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ

যৌতুক আমাদের সমাজে নতুন নয়। এটি অর্থনৈতিক শোষণের প্রাচীনতম হাতিয়ার। যৌতুকের মতো জঘন্য প্রথা চালু থাকার কারণে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আজ অভিশপ্ত ও কলঙ্কজনক অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা সুষ্ঠু ও সুশৃংখল বিবাহ ব্যবস্থার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুক গ্রহণ ও প্রদানে দণ্ডনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও যৌতুকী বিবাহ বেড়েই চলেছে। যৌতুকের দেনা মেটাতে গিয়ে শত শত পরিবার চরম অর্থ সংকটে নিপতিত হচ্ছে। যৌতুককে কেন্দ্র করে অত্যাচার-নির্যাতন, উৎপীড়ন-নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড, খুন ও আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। ফলে পুরো সমাজ ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। তাই সমাজ বিধ্বংসী এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ থেকে এ অভিশপ্ত ও অবৈধ রীতি উচ্ছেদে এগিয়ে আসতে

---

[৩৩]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: আল-আকফাউ ফিদদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং-৫০৯০ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ

[৩৪]. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মাকতাবাতুশ শামিলা, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, ২০০১, হাদীস নং-২৪৫২৯ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

www.pathagar.com

হবে। গণ সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি এই জঘন্য প্রথা উচ্ছেদে আরো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা :** ইসলাম কোনভাবেই যৌতুক সমর্থন করে না। ইসলাম এটাকে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ ও অবৈধ উপায়ে অর্থ লেনদেন হিসেবে গণ্য করে। ইসলামের এই মূল্যবোধ সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করতে পারলে যৌতুক অনেকাংশে কমে যাবে। আমেরিকার পপুলেশন কাউন্সিলের সমীক্ষায় দেখা যায়, "বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলে বা এলাকাগুলোতে ইসলামী মূল্যবোধ তুলনামূলকভাবে বেশি চর্চা হয়, সে সব এলাকাগুলোতে যৌতুকের প্রবণতা কম পরিলক্ষিত হয়"।[৩৫]

২. **শিক্ষা ব্যবস্থায় যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ :** শিক্ষিত পরিবারের চেয়ে অশিক্ষিত পরিবারে যৌতুকের চর্চা বেশি হতে দেখা যায়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় যৌতুক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করলে যৌতুক কমে যাবে। এ লক্ষ্যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌতুক যে অত্যন্ত জঘন্য ও অভিশপ্ত ও অনৈসলামিক প্রথা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষাদান করতে হবে। তাহলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠবে। আর এটি যৌতুক নির্মূলে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৩. **পরিবার ও সমাজে গণসচেতনতা বৃদ্ধি :** যৌতুক দমন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে হবে পরিবার ও সমাজকে। পরিবার ও সমাজে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।

৪. **আইনের কঠোর বাস্তবায়ন :** দেশে যৌতুক বিরোধী কঠোর আইন রয়েছে। কিন্তু এর কঠোর বাস্তবায়ন নেই। বলতে গেলে কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই। তাই যৌতুক বিরোধী আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ বিষয়ে আরো তৎপর হতে হবে। যৌতুক লোভীদের পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **সরকারের গণসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ :** সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। অনেক বিবাহের যোগ্য কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা যৌতুকের কারণে কন্যা বিবাহ দিতে পারছে না। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ সকল

---

৩৫. *Reforming marriage practices in Bangladesh*, prepared by Sajeda Amin, Brief no. 31 January, 2008

www.pathagar.com

কন্যাদের যৌতুক বিহীন গণবিবাহের আয়োজন করা যেতে পারে। যৌতুকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্যচিত্র নির্মাণ, আলোচনা সভা ও যৌতুক বিরোধী প্রচার অভিযান চালানো যেতে পারে। এ সব উদ্যোগ গ্রহণ করলে জনসাধারণের মাঝে দ্রুত যৌতুক বিহীন বিবাহের মানসিকতা তৈরী হবে।

৬. **মিডিয়ার যৌতুক বিরোধী প্রচারণা** : দেশে সব সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি চ্যানেলগুলো যৌতুক প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এ লক্ষ্যে তথ্যচিত্র, টকশো, আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যৌতুকের কুফল ও ভয়াবহ পরিণতির কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।

৭. **সামাজিক সংগঠনগুলোর যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম** : দেশে অনেক সামাজিক সংগঠন রয়েছে। তারা সামাজিক অন্যান্য কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রমের পাশাপাশি যৌতুক বিরোধী জোরদার প্রচারণা চালাতে পারে। যৌতুক বিহীন গণবিবাহ, তথ্যচিত্র ও আলোচনা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যৌতুক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

৮. **গ্রাম-গঞ্জে যৌতুক প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা** : গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি পাড়ায় ও মহল্লার গণ্যমান্য মুরব্বীদের নেতৃত্বে যৌতুক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তারা যৌতুকের ভয়াবহতা ও কুফল জনসমক্ষে তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন। যৌতুকলোভীদের পাকড়াও করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে সোপর্দ করতে পারেন। প্রতিটি পাড়ায় ও মহল্লায় যৌতুক বিরোধী এ সব কার্যক্রম গ্রহণ করলে যৌতুকের অপতৎপরতা হ্রাস পাবে।

৯. **জুমার খুতবায় যৌতুক বিরোধী প্রচারণা** : সর্বস্তরের মুসলিম জনতা শুক্রবার জুমার জামাতে শরীক হয়। জুমার বয়ানে ইমামগণ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। যা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুন্দর জীবন গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রেখে থাকে। ইসলামে যৌতুক একটি ঘৃণ্য কাজ। ইমামগণ এ বিষয়ে মুসল্লীদের সম্যক ধারণা দিতে পারেন। যৌতুকের সামাজিক ও ধর্মীয় কুফল এবং ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরে যৌতুক বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারেন। ইমামগণ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করলে যৌতুকের মতো অনেক সামাজিক ঘৃণ্য প্রথা সম্পর্কে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী হবে, যা এ সব জঘন্য প্রথা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ নির্মূলে সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

১০. **আলেম সমাজ ও নিকাহ রেজিস্ট্রারদের সম্পৃক্তকরণ :** সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও ঘৃণ্য প্রথা দূরীকরণে আলেম সমাজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আলেম সমাজ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে নৈতিক পদস্খলন ও সমাজের অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করেন এবং সুন্দর চরিত্র গঠনে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে থাকেন। যা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অনেক উপকারে আসে। তাই আলেম সমাজ যৌতুকের কুফল, শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইহ-পরকালীন পরিণতির কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে জনসাধারণকে অবহিত করতে পারেন এবং যৌতুক প্রতিরোধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। সেই সাথে নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ বিবাহের কাবিন করার সময় এবং বিবাহ পড়ানোর সময় যাতে যৌতুক বিষয়ক লেনদেনের বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এর প্রতিও গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।

উপসংহার

যৌতুকের ছোবলে সমাজের অসংখ্য নারীর জীবন আজ ক্ষত-বিক্ষত। নারী নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনা ঘটছে যৌতুককে কেন্দ্র করে। অগণিত অসহায় নারী যৌতুকের দংশনে বিবাহের মেহেদী মুছতে না মুছতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যাকে বিবাহ দিতে না পেরে দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন। খুন-খারাবি, হত্যা, এসিডে ঝলসে দেয়া, কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। তাই যৌতুক প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সময়ের দাবী। যৌতুক বিরোধী আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা জোরদার করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে যৌতুক বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি সমাজ ও পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা ও সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের মানসিকতাই পারে যৌতুকের মতো ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা নির্মূল করতে। সমাজের এ সব ঘৃণ্য প্রথা প্রতিরোধ ও নির্মূল করতে পারলে তা একটি সুস্থ সুন্দর সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে-

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নালে মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো প্রবন্ধ গৃহীত হবে না।

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গবেষক জার্নালের ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখতে হবে।

যেমন– গ্রন্থ :

ক. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইসমু মানিইয যাকাত, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১০

গ. যিকরা তাহা হুসাইন, *জামহুরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ,* ওযারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

www.pathagar.com

প্রবন্ধ :

* Dr. Taslima Monsoor, Dissolution of Marriages on Test A Study of Islamic Family Law and Women, *Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume : 15, Number : 1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে* যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of Islamic law and judiciary.*

৭. আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) টেক্সট দিতে হবে। Secondary source এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। **কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** আল-কুরআন, ২ : ১৫। **হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–**ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় (ابواب/كتاب):, অনুচ্ছেদ (باب):........, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

www.pathagar.com

REG. NO. DA -6100, ISLAMI AIN O BICHAR : JANUARY-MARCH : 2013

আমদানি ও রপ্তানি কর্মে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জন : প্রেক্ষিত ইসলাম
ড. মাহফুজুর রহমান

কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিধিবদ্ধ আইন ও ইসলামী বিধান : একটি পর্যালোচনা
এহতেশামুল হক

বাংলাদেশে মাদক ও মাদকাসক্তির বিস্তার ও প্রভাব : উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
ড. মো: শামছুল আলম
সৈয়দ আমিনুল ইসলাম

ইসলামী বীমার শরঈ ভিত্তি ও বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায়
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

যৌতুক প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
কামরুজ্জামান শামীম